একক ঃ ৪ নারী উন্নয়ন

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ নারীর সামাজিক পদমর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৩ কিছু বাস্তব চিত্র

৪.৪ বিচার্য বিষয়সমূহ

৪.৫ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

৪.৬ গৃহীত পদক্ষেপ

৪.৭ নারী কল্যাণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং ধারাসমূহ

৪.৮ প্রভাব

৪.৯ নাগরিকদের ভূমিকা

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১ ভূমিকা

নারীর সামাজিক পদমর্যাদা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এখনো মহিলারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে খুবই পিছিয়ে। মূলত আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী হলেও বেশ কিছু অন্য কারণও রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি পরিস্ফুট হয়। বিভিন্ন প্রথা এবং চিরাচরিত আইনের মধ্যে সেই সকল কারণগুলি বিদ্যমান।

আমরা জানি যে শিশুর যত্ন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ (জনগোষ্ঠী) এবং দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে নারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু চিরকালই তারা অবহেলিত। বেদ-এ নারীরদের উচ্চ মর্যাদার স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদমর্যাদারও পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষে পুরুষদের তুলনায় নারীর সামাজিক পদমর্যাদা অনেকটাই নিম্নমানের। এই অবস্থায় উন্নতি না ঘটালে কোন ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে নারী-পুরুষের সম-মর্যাদার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা সামগ্রিক উন্নয়নেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের দেশের মহিলাদের সৌন্দর্য, লাবণ্য, মাধুর্য, মিতভাষিতা, নম্রতা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের প্রবণতায় গর্ব অনুভব করতেন। তিনি বলেছিলেন ভারতীয় নারীদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধারণ মানুষের ব্যবহারে তার প্রতিফলন দেখা যায় না।

৪.২ নারীর সামাজিক পদমর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯০১ সালে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ৯৭২ মহিলা ছিল। ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯৩৪। ১৯৯৭ সালে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র যেমন আই.এ.এস্., আই.পি.এস., আই.এফ.এস্, ইত্যাদিতে মহিলারা মাত্র ৭.৫ শতাংশ স্থান অধিগ্রহণ করে ছিল, আর অন্যান্য সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রায় ১৫ শতাংশ।

লোকসভায় মহিলারা বরাবর ১০ শতাংশের কম আসনে প্রতিনিধিত্ব করেছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিসংখ্যান ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৯৬ সালে এমন অপরাধের সংখ্যা ছিল ১,১৫,৭২৩ যা বেড়ে ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় ১,২১,২৬০। অর্থাৎ এক বছরে অপরাধের সংখ্যা ৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মৃত্যুহার বেশি। বিদ্যালয়-ছুটদের মধ্যেও একই চিত্র দেখা যায়। অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের পারিশ্রমিক পুরুষদের পারিশ্রমিকের তুলনায় কম। কিন্তু মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ও অবিচার সম্বন্ধে সচেতন নয়।

শত শত বছর ধরে আমাদের দেশের মহিলারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িত এবং শোষিত। নিপীড়ন নানানভাবে হতে পারে যেমন – পণ, প্রহার, বহু-বিবাহ, ধর্ষণ, বৈধব্য, নারী-পাচার, মানসিক নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। সংবিধানে সম-মর্যাদার কথা বলা হলেও শিক্ষা, পারিশ্রমিক, বেতন রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই মহিলাদের সেই মর্যাদা দেওয়া হয় না।

যে কোন স্থানের নারী পুরুষের শিক্ষার হারের তুলনামূলক বিচার করে নারীর পদমর্যাদা অনুধাবন করা যায়। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের শিক্ষার হার পুরুষদের শিক্ষার হার অপেক্ষা অনেকটাই কম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং অন্যান্য কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের সর্বত্র এই চিত্র বিদ্যমান।

পরিবারে ও সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সাধারণত অবহেলিত এবং নানা বৈষম্যের শিকার হয়। নিরক্ষরতা যা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় পাপ, লজ্জা এবং দেশের অভিশাপ – তা এই বৈষম্যের ফল। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দরিদ্র মহিলারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। দিন মজুরি হিসাবে তারা খুব কম আয় করে। যেহেতু তারা অদক্ষ তাই সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পায় না। স্বাভাবিক কারণেই তারা নীরব ও নিশ্চুপ থাকে।

৪.৩ কিছু বাস্তবচিত্র

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে মহিলাদের খুব বেশি কাজ করতে হয়, ফলে – সময়ের অভাবে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। স্থানীয় স্তরের স্বায়ত্ব শাসিত সরকারের

সরকারি কিংবা বে-সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শিশু, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা এবং বিকলাঙ্গ মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ পরিষেবা প্রদান করা এবং বাড়ির কাজকর্মে পুরুষ ও মহিলার সামনে অংশগ্রহণের জন্য মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিশু ও আত্মীয় পরিজনদের যত্নের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং তা পালন করার জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করা উচিত।

মহিলারা পরিবার ও সমাজে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর জন্য তারা কোন স্বীকৃতি পায় না। পুরুষেরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে, শোষণ করে। ফলে তারা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন এবং দুর্বল শ্রেণিভুক্ত হিসেবেই থাকে। এটা দুর্ভাগ্যের যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যাচ্ছে কন্যাসন্তান ও মহিলাদের মৃত্যুর হার বেশি। শিক্ষার হার কম। অধিকাংশ মহিলা অপুষ্টির শিকার। উচ্চ বেতনের চাকুরিতে মহিলাদের নিযুক্তি খুবই কম। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে পারিশ্রমিকও কম। তারা নানান ধরনের বৈষম্যের শিকার। তাছাড়া, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও অত্যাচারের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী। মহিলারাও তাদের দায়ভার এড়াতে পারে না। তাদেরকেও ঐ সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ৫ লক্ষাধিক মা গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালীন সময়ে মারা যায়। তার মধ্যে প্রায় ৯৫ বেশি বয়সে গর্ভধারণ, ঘন ঘন ও বহুবার গর্ভধারণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, হাতুড়ে চিকিৎসক দ্বারা যত্রতত্র গর্ভপাত, গর্ভাবস্থায় নিয়মিত টিটেনাস্ টক্সয়েড্ ও অন্যান্য পরিষেবা না গ্রহণ করার ফলে মায়েদের মৃত্যুর হার বেশি।

৪.৪ বিচার্য বিষয়সমূহ

পূর্বের রীতি অনুসারে মহিলাদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরোক্ষ উপভোক্তা রূপে নয়, তাদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও অংশীদার হিসাবে দেখতে হবে।

সমাজে মহিলাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের এবং বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর-সুস্থ পরিবেশে জীবন ধারণের সমান অধিকার রয়েছে। পরিকল্পনার সর্বস্তরে তাদের জীবন ধারণের পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখা দরকার।

পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব, জমির মালিকানা উপভোগ এবং নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণের সমান অধিকার মহিলাদের রয়েছে। সরকারি দপ্তরে চাকুরি, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এবং কর্মস্থলের সর্বত্র তাদের সমান অধিকার আছে।

যেহেতু ভারতবর্ষে মহিলারা দীর্ঘদিন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাই তাদের সমস্যা সমাধানের কথা আলাদাভাবে ভাবা দরকার। বিষয়টি উপলব্ধি করে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নে বেশি বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ প্রাসঙ্গিক হলেও উল্লিখিত বহুমুখী সমস্যা ও তার গভীরতার কাছে খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি।

সম্ভবত কোন দেশই মহিলাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কানাডা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল – যার ফলে সেখানে মহিলাদের শিক্ষার হার ১০০ শতাংশ, জন্মহার কম, শিশুমৃত্যু কম এবং আয়ু বেশি। প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। সে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ১০০ শতাংশ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ২০০১ সালেও দেখা যাচ্ছে কুটি কোটির বেশি মানুষ নিরক্ষর, অসংখ্য বেকার এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানীয় জল পরিষেবা অপর্যাপ্ত। জীবন ও জীবিকার সর্বস্তরেই অপ্রতুল অবস্থা। আর মহিলারা চরমভাবে এই পরিস্থিতির শিকার।

কিছু দৃষ্টান্ত ইঙ্গিত দেয় যে মহিলারা আশানুরূপভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এমনকি শিল্প ও কলকারখানায় তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম দক্ষ এবং কম পারদর্শী – এমন প্রাচীন প্রচলিত মানসিকতা প্রযুক্তি জগতের কর্মে মহিলাদের নিয়োগের অন্তরায়। যদিও প্রযুক্তি জগতের বিভিন্ন সংস্থায় মহিলাদের পারদর্শিতা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এইচ.এম.টি ঘড়ি তৈরি সংস্থায় অধিকাংশ প্রযুক্তিগত কাজ মহিলারা দক্ষতার সঙ্গে করে – যার ফলে সংস্থাটি প্রতিযোগিতার বাজারে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। ফলস্বরূপ প্রযুক্তিগত কর্মে মহিলাদের নিয়োগ না করার প্রবণতা বিদ্যমান।

৪.৫ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বলা যায় যে জন জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ জরুরী। তাদের অংশগ্রহণ না থাকলে পরিষেবার গুণগত মান সঠিক হয় না। মহিলারা কেবল গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে এরূপ চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তন করার সময় এসেছে। তাদেরকে অবশ্যই সরকারি পরিষেবা ও পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে – মহিলারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারে বলেই সামগ্রিক উন্নয়নের সুন্দর বাতাবরণ তৈরি হয়।

মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতা খুবই জরুরি। তাদের অধিকার, জীবনের গুণগত মান উন্নয়ন, নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা ইত্যাদির জন্য সাক্ষরতার সঙ্গে প্রবহমান শিক্ষা এবং সচেতনতা কর্মসূচি যুক্ত করতে হবে। এখানে বলা দরকার সাক্ষরতা কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণে অন্তরায় এমন বেশ কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ–

- পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অসহযোগী মানসিকতা ও আচরণ।
- চিরাচরিত বা প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার।
- গৃহস্থালীর কাজকর্মের পরে সময়ের অভাব।
- পুনঃপুন গর্ভধারণ
- উপযুক্ত শিশু-যত্ন পরিষেবার অভাব।
- সুসংহত পরিকল্পনার অভাব এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব না দেওয়া।

নারী কল্যাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তাদের সংগঠিত করা এবং কার্যে নিয়োগ করা। প্রক্রিয়াটি রাতারাতি হয় না। মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাপার সময় সাপেক্ষ। মহিলাদের সঙ্গে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সু-সংগঠিত করার প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে। সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা জরুরি। মহিলাদের সংগঠিত করার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে গোষ্ঠী গঠন।

লিঙ্গ সমতার কথা মাথায় রেখে নারী কল্যাণ প্রক্রিয়ায় পুরুষদেরও অংশগ্রহণ করা দরকার। তবে তাদের অন্তর্ভুক্তি যেন আধিপত্যের রূপ না নেয়। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে প্রক্রিয়াটি সহজ হবে। স্থানীয় স্তরে এবং জেলা, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে মহিলারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারে এবং পরিচালকমণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা দেখতে হবে। এর জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের সুযোগ দেওয়া দরকার। অর্থাৎ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ থেকে প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণের সর্বস্তরে মহিলাদের নিযুক্তি এবং অংশীদার হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য আরো কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সর্বপ্রথম, সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস, আচার আচরণ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে লাগাতার সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরী। এবং নিম্নলিখিত উপায়ে তা সম্ভব–

● প্রচারাভিযান ও শিক্ষার মাধ্যমে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে মহিলাদের অধিকার এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যম, মহিলা মণ্ডল এবং স্থানীয় সংগঠনকে কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে নারী ক্ষমতায়নের উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি হবে।

● শহর ও গ্রামের গরিব মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যেমন – জল, জ্বালানী, গো-খাদ্য এবং শিশু-যত্ন পরিষেবার (যা বর্ধিত আকারে আই. সি. ডি. এস. কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভব) সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে।

পরিবার, বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্ট ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে।

● সামাজিক বিপদ এবং কু-প্রথা যেমন – বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারে (বাড়ি, জমি গবাদি পশু, পারিবারিক শিল্প) মহিলাদের বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করতে হবে।

● ১০০ শতাংশ ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি করতে হবে এবং বিদ্যালয়-ছুটদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

● ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচি শুরু করা দরকার।

● মহিলাদের চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে তারা যাতে যথাযথ পারিশ্রমিক পায়, সহজে ঋণ পায়, কাঁচামাল পায় এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির সুযোগ পায় তার জন্য সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়া দরকার।

● সমাজ ও জনজীবনে মহিলারা যাতে যৌন পীড়ন, অত্যাচার, ধর্ষণ ও দেহ ব্যবসার সম্মুখীন না হয় তা দেখতে হবে।

● বিনা ব্যয়ে মহিলাদের জন্য আইনি শিক্ষা ও আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

● রাজনৈতিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে মহিলারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ এবং পঞ্চায়েতের সর্বস্তরে, বিধানসভা ও লোকসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা দরকার।

৪.৬ গৃহীত পদক্ষেপ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বলা যায় যে শিক্ষা, সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহিলাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকেই তাদের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হতে হবে। বলাবাহুল্য, তাদের জীবনের উৎকর্ষতা বা গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। শিক্ষার সঙ্গে দক্ষতাবৃদ্ধি এবং চাকুরিতে নিয়োগের মাধ্যমে তারা যাতে পুরুষদের সমানতালে ও সম-মর্যাদায় বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে তা দেখা দরকার।

মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করেছে। তাদের উন্নয়নের জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ডঃ ফুলরেণু গুহকে চেয়ার-পার্সন করে ১৯৯০ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দেশব্যাপী নারী সংগঠন ও সমাজকর্মীদের নিরন্তর চেষ্টায় এই কমিশন গঠন সম্ভব হয়েছে। মহিলারা যাতে দ্রুত ন্যায় বিচার পায় তার জন্য পারিবারিক আদালত ও বিশেষ আদালত গঠনও গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৭ নারী কল্যাণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং ধারাসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৫(৩) নং ধারায় বৈষম্য দূর করার জন্য মহিলাদের সপক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্যকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাফল্য অর্জনের জন্য কেবলমাত্র সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। এই সকল ধারাগুলি বাস্তবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা জরুরী। এর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন–

● ১৯৮৩ সালে মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী, আইনজীবী ও সরকারি অফিসারদের নিয়ে ভলান্ট্যারি এক্শন বিউরো গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করা, (খ) প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও (গ) ঐসকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

● মানসিক ও আইনী সহায়তা এবং পরামর্শ দানের জন্য নামী বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় এবং শহরে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেন্টার চালু করা হয়েছে।

● লিগ্যাল এইড সার্ভিস বিউরো এবং এড্ভাইজারি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

● বেশ কিছু আইন যেমন–(ক) মেডিক্যাল ট্যারমিনেইশন অব্ প্রেগ্ন্যানসি এক্ট্, (খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, (গ) হিন্দু বিবাহ আইন, (ঘ) পণপ্রথা প্রতিরোধ আইন, (ঙ) হিন্দু এডপ্শন্ এন্ড্ সাসটেন্যান্স এক্ট্ ১৯৫৬, (চ) সাপ্রেশন্ অব্ ইম্মোরাল ট্রাফিক ইন্ উম্যান্ এন্ড্ গার্লস্ এক্ট্, (ছ) মুসলিম বিবাহ আইন ইত্যাদি।

৪.৮ প্রভাব

১৯৭৯ সালের সি. ডব্লিউ. এস. আই. প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা হয়েছে বিগত তিন দশক ধরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগ কেবল মুষ্টিমেয় শহরে, উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মহিলারাই পেয়েছে। মহিলাদের বৃহত্তর অংশই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকুরি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তেমন কোন সুবিধা পায়নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছে। এর পিছনে দ্বি-মুখী কারণ বিদ্যমান। প্রথমত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং পুরুষদের কর্তৃত্ব এবং দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ভুলভ্রান্তি এবং অসাফল্য। ফলস্বরূপ, একবিংশ শতাব্দীতেও মহিলাদের বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর, অধিকার ও ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং চিরাচরিত বা প্রচলিত রীতি-নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মনে রাখতে হবে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নারী ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াই একমাত্র উপায়। বস্তুতপক্ষে, নারী ক্ষমতায়ন হল – পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে বিদ্যমান অত্যাচার, বঞ্চনা, নির্ভরশীলতা, অসহায়তা, বৈষম্য এবং শোষণের হাত থেকে নারীদের মুক্তির পথ।

সাধারণত পরিবারের মধ্যে মহিলাদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকেও খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গৃহস্থালীর কাজকর্মে তাদের সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয় এবং বৃহত্তর জগতে ও সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় না।

২০০১ সালে নারী ক্ষমতায়ন বর্ষ উদ্যাপন করা হয়। কিছুদিন আগে জাতীয়স্তরে নারী ক্ষমতায়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। দেখা যাচ্ছে ঐ সকল প্রচেষ্টা ক্ষমতায়নের পক্ষে ফলপ্রসূ হলেও যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন সমস্যা সমাধানের শেষ কথা হতে পারে না। তার সঠিক প্রয়োগ এবং মহিলারা যাতে আইনের উপকার পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার নারী উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছে। বে-সরকারি সংস্থা ও পঞ্চায়েত প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করছে। এর ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মহিলাদের অবস্থা কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এখনো অনেক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে কেবলমাত্র নারী ক্ষমতায়নের সাংবিধানিক ব্যবস্থা খুব বেশি কার্যকরী হতে পারে। এর জন্য চাই শিক্ষা ও সচেতনতা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ করে মহিলাদের আচরণবিধি পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা মাফিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তাদেরকে সঠিকভাবে প্রভাবিত করতে হবে। সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থা একযোগে কাজ করলে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

উক্ত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, নারী ক্ষমতায়ন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। সঠিক পরিকল্পনা, একযোগে প্রকল্প রূপায়ণ, মানুষের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে এটা সম্ভব। তৃণমূলস্তরের সংস্থা, বে-সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান একযোগে এই কাজ করতে পারে। মহিলাদের সচেতন ও প্রভাবিত করার জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়া, গোষ্ঠী আলোচনা, প্রদর্শনী এবং সফল কর্মসূচি পরিদর্শন করা দরকার। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য পরিস্থিতি অনুসারে এক বা একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে সাফল্য হঠাৎ করে আসে না। সুপরিকল্পিত প্রয়াসের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ সাফল্য অর্জন করা যায়।

৪.৯ নাগরিকদের ভূমিকা

নারী উন্নয়নে নাগরিকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বলাবাহুল্য, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় মহিলা তথা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অবশ্যই দরকার। যদিও এই ধারণার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ হয়েছে। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত পিছিয়ে পড়া মানুষদের ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। মনে রাখতে হবে, যে কোন গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য ঐ গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পকিল্পনা করতে হবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব–

- সক্রিয় অংশগ্রহণ
- নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষতা অর্জন
- সম্পদ সংগ্রহ ও তার সঠিক ব্যবহার
- নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা সংগঠন ইত্যাদি।

বর্তমানে–

- দরিদ্র মহিলাদের সংগঠিত করা
- তাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করা
- এবং অধিকতর পছন্দের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ

ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নজরে আসে।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মহিলাদের নিজস্ব সমস্যা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সংগঠিত করা সম্ভব। গোষ্ঠী গঠন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বে-সরকারি সংস্থা গরীব মহিলাদের সাহায্য করতে পারে। আর অন্যান্য বিষয়গুলি তারা নিজেরা করে নিতে পারবে। বিভিন্ন সংস্থা কেবল সহায়তা করতে পারে মাত্র।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন – ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যেভরা এক দেশ। এই বৈচিত্র্য দেশের সর্বত্র বিদ্যমান। এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের কিছু কিছু অংশে মহিলারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে। একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে তপঃজাতি, তপঃউপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনো পিছিয়ে। এদের কথা ভাবতে হবে। তাছাড়া মহিলাদের জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মহিলারা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এখনো পুরুষদের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। এই অবস্থা উন্নতির জন্য পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলি কার্যকরা করা দরকার। কোন উন্নয়ন সংস্থা একা এই কাজ করতে পারে না। নারী ক্ষমতায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক।

৪.১০ উপসংহার

ভারতবর্ষের মতো একটি দেশ যেখানে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে সেখানে মহিলাদের দুরবস্থা দীর্ঘদিন মেনে নেওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, মহিলাদের সামনে চাকুরির সুযোগ ক্রমশ বাড়ছে, তারা নতুন নতুন দায়িত্ব নিচ্ছে – যা দীর্ঘদিন পুরুষদের অধিকারে ছিল। মহিলারা এখন বহির্জগতের কাজে যুক্ত হচ্ছে। মূলত তিনটি কারণে তা সম্ভবপর হয়েছে–

- শিক্ষিতা ও দক্ষ মহিলার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে
- দরিদ্র শ্রেণির মহিলারা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সফল হয়েছে
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের নিযুক্তির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

বিভিন্ন সম্মেলন ও ঘোষণা যেমন–

(১) মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার (১৯৫২)

(২) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (১৯৬৬)

(৩) আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ - ১৯৭৫

(৪) মহিলাদের সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্মেলন (১৯৭৯)

ইত্যাদিতে জনজীবনে মহিলাদের সমান সুযোগ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষিত দশক (১৯৭৬-৮৫) মহিলাদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল–

(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিশুর যত্ন

(খ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

(গ) ট্রাইসেম্ ও আই.আর.ডি.পি. তে সংরক্ষণ

(ঘ) শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধি

(ঙ) উম্যান ডিভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন গঠন

(চ) বিভিন্ন রাজ্যে উম্যান কমিশন গঠন

(ছ) পারিবারিক আদালত ও পরামর্শদান কেন্দ্র

(জ) পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় আসন সংরক্ষণ

(ঝ) রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ গঠন

(ঞ) বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বাড়াবার সুযোগবৃদ্ধি ইত্যাদি।

তাছাড়া, বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন–

(ক) সমান বেতন প্রদান আইন (১৯৭৬)

(খ) জাতীয় গৃহ নির্মাণ নীতির সর্বস্তরে মহিলাদের যুক্ত করা ইত্যাদি।

মহিলারা নিরক্ষর থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং তা উপলব্ধি করে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন মহিলাদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলে বর্তমানে অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে সারা দেশে, গ্রামে ও শহরে হাজার হাজার মহিলা সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর ও প্রবহমান শিক্ষা কর্মসুচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ধারা দেখা গেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিগত দশ বছরে নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রচেষ্টার দরকার। আবার, গ্রামে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। তাই পরিকল্পনার সময় এবং রূপায়ণকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি ভাবতে হবে। গ্রামের মানুষকে সচেতন করার জন্য গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত, সমবায়, মহিলামণ্ডল, যুব সংগঠন, বে-সরকারি সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একযোগে কাজ করা উচিত। স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা ও সংস্থা শনাক্ত করে উপযুক্তভাবে তাদের কাজে লাগালে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হতে পারে। মনে রাখতে হবে – এরূপ সহযোগিতা, একযোগে কাজ করা এবং মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

নারী ক্ষমতায়নের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন। বর্তমানে দেশের সর্বত্র নারী ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসাবে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে। সরকার, পঞ্চায়েত এবং বে-সরকারি সংস্থা এই ধরনের কাজকে প্রাধান্য দিচ্ছে যাতে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন এই কর্মকাণ্ডের ফলে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাস্তবক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা এবং সর্বোপরি তৃণমূলস্তরে নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেহেতু গ্রুপের প্রতিটি সদস্যার নিয়মিত জমা ও ঋণ পরিশোধের উপর গ্রুপ দাঁড়িয়ে তাই সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা গ্রুপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গোষ্ঠীতে যোগদানের ফলে সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। যা – পূর্বে কেবলমাত্র আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সম্ভব হত। এটা অনস্বীকার্য যে মহিলাদের অধিক সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য তাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে এবং দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। এই ধরনের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

কাজ করছে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মহিলারা পারস্পরিক উন্নতির জন্য আর্থিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

এরূপ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের দেশের মহিলারা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তারাই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী জীবনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বি.আর.মেহেতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে অনেকদিন আগেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের কাছে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ খুব একটা ছিল না। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে ১৯৯৩ সাল থেকে মহিলারা পঞ্চায়েতে এক-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্ব করছে। এবং চেয়ারম্যান পদটি তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এরফলে অনেকেই ব্যক্তিজীবন থেকে জনজীবনের উন্নয়নের কাজে নিজেদের যুক্ত করেছে। তারা এখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের সদস্যা হচ্ছে। যদিও তাদের অনেকেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিবার কিংবা রাজনৈতিক দলের পুরুষ সদস্যরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে-যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অঙ্গ। তা সত্ত্বেও মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সদর্থক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) স্টেটাস অব্ উম্যান ইন্ ইন্ডিয়া - দ্য ন্যাশন্যাল্ কমিটি

(খ) স্ট্রাগল্ অব্ উম্যান্ এট ওয়ার্ক - সুজাতা গোথস্কার (সম্পাদিত)

(গ) স্টেটাস অব্ উম্যান্ এন্ড্ পপুলেশন্ গ্রোথ ইন্ ইন্ডিয়া - কে.পি.সিং

(ঘ) ইন্ডিয়ান উম্যান্ ইন্ এ চেঞ্জিং ইন্ডাসট্রিয়াল সিনারিও - নির্মলা ব্যানার্জী

(ঙ) উম্যান্ এন্ড দ্য ল্য - দ্য লিগ্যাল্ সার্ভিস ক্লিনিক ফর্ উম্যান এন্ড্ চিলড্রেন

(চ) উম্যান্ ইন ইন্ডিয়া - তৃপ্তি দেশাই

(ছ) হিউম্যান্ রাইটস্ - উম্যান্ রাইটস্ - মল্লদি শুভাম্মা

(জ) স্টেটাস এন্ড এম্প্লয়মেন্ট অব্ উম্যান ইন্ ইন্ডিয়া - ইউ.ললিথা দেবী

৪.১২ অনুশীলনী

(১) ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা কেমন - তা বিশ্লেষণ করুন।

(২) নারীর সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগ আলোচনা করুন।

(৩) নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৫ যুব কল্যাণ

গঠন

৫.১ ভূমিকা

৫.২ ভারতবর্ষে যুবকদের জনসংখ্যার চিত্র

৫.৩ যুব কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্প

৫.৪ বে-সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার যুবকল্যাণ কর্মসুচি

৫.৫ যুবকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৫.৭ অনুশীলনী

৫.১ ভূমিকা

যুবকরা সমাজের সবচেয়ে স্পন্দনশীল ও সৃজনশীল অংশ। যে কোন দেশে বিশেষকরে ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুবকদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে যদি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঞ্চালিত করা যায় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। যুবকদেরও স্বেচ্ছাশ্রম, সহযোগিতা, স্ব-নির্ভরতা এবং সমাজ কল্যাণ ও সার্বিক উন্নয়নের কাজে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তারাই জনগোষ্ঠীর গতিশীলতার প্রতীক। সুতরাং, যুবকদের মধ্যে সচেতনতা এবং ক্ষমতায়ন - শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হবে। যেহেতু ভারত নতুন শতাব্দীতে ধীরে ধীরে উন্নয়নশীল অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় রূপান্তরিত হতে চায় তাই জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতে যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রণী ভারতের দায়িত্বশীল নাগরিক হতে হবে। তাই, দেশের সমস্যা বিশেষকরে যুবকদের সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতন হওয়া দরকার। আমাদের দেশে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেহাল প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তথ্য, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ও বিনোদনের সুযোগের অভাব রয়েছে। শারীরিক ও মানসিক শোষণের সমস্যা, পরিবেশের ক্ষয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বস্তু-জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সমস্যা ইত্যাদি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে নয়, যুবকদেরও অনেকটাই প্রভাবিত করছে। ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যুবকদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া জরুরি।

৫.২ ভারতবর্ষে যুবকদের জনসংখ্যার চিত্র

দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে যুবকদের জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। নিম্নে জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হল–

সাল	যুব জনসংখ্যা			সেক্স রেসিও	শতকরা হার		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৭১	৮৫৪৯৯	৮২১৩৮	১৬৭৬৩৭	৯৬১	৩০.১	৩১.১	৩০.৬
১৯৮১	১১৩৪৩৩	১০৭২৩৫	২২০৬৬৯	৯৪৫	৩২.১	৩২.৫	৩২.২
১৯৯১	১৪৬০৩৬	১৩৮৯৬৬	২৮৫০০২	৯৫২	৩৩.১	৩৪.০	৩৩.৬
২০০১	১৮৪২৭৮	১৭১৬৫০	৩৫৫৯২৮	৯৩১	৩৫.২	৩৫.১	৩৫.২
২০০৬	২০৯২০৩	১৯২৩১২	৪০১৫১৫	৯১৯	৩৭.১	৩৬.৪	৩৬.৮
২০১১	২২৫৮৪২	২০৮১৬৬	৪৩৪০০৯	৯২২	৩৭.৩	৩৬.৪	৩৬.৭
২০১৬	২৩১৫৮২	২১৬৪৯৬	৪৪৮০৭৮	৯৩৫	৩৫.৭	৩৫.১	৩৫.৫

জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীতে বয়সের বিন্যাসও বদলে যায়। যুবকদের জনসংখ্যা ৩০.৬ শতাংশ (১৯৭১) থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ৩৬.৮ শতাংশতে পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অনুমান করা যায়, পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা কমবে এবং ২০১৬ সালে ৩৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেখা গেছে, মহিলা জনসংখ্যায় যুবতীদের শতকরা হার - পুরুষ জনসংখ্যায় যুবকদের শতকরা হার অপেক্ষা বেশি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের পরে যুবকদের শতকরা হার বাড়ছে। সুতরাং অদূরভবিষ্যতে যেকোন সময় যুবকরাই জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ হবে। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে, ১৯৭১ সালে ১৬৭৬.৪ লক্ষ যুবক ছিল, যা ২০১৬ সালে ৩৫৫৯.৩ লক্ষ হবে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে নারী-পুরুষের অনুপাতে (সেক্স রেসিও) দেখা গেছে নারীর সংখ্যা কম। যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ সালে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অনুপাত ছিল ৯৬১ এবং সমগ্র জনসংখ্যায় ছিল ৯৩০. এই অনুপাত ক্রমশ কমছে এবং ২০০৬ সালে কমে ৯১৯ হতে পারে। তারপর এই অনুপাতের উন্নতি ঘটতে পারে এবং ২০১৬ সালে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯৩৫ ও সমগ্র জনসংখ্যায় ৯৪৭ হতে পারে।

ভারতের ও বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স

মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ভারতে মহিলাদের কম বয়সে বিবাহের ফলে জন্মহার উচ্চ। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের দেশে মহিলাদের বিবাহের গড় বয়স কম। শহর এলাকায় বিবাহের গড় বয়স (২০.৭) গ্রামীণ এলাকার গড় বয়সের (১৯.১) তুলনায় ১.৬ বছর বেশি। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত একই চিত্র ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের মহিলাদের বিবাহের গড় বয়সের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে কম ছিল (১৮.১ বছর)। বিহারে ১৮.৫ এবং মহারাষ্ট্রে ১৮.৯ ছিল। কেরালাতে সবচেয়ে বেশী (২১.৭ বছর) ছিল। তামিলনাড়ুতে ২০.৯ এবং পাঞ্জাবে ২০.৮ বছর ছিল।

বয়স ভিত্তিক বা বয়স অনুসারে জন্মহার

প্রজনন সময়ে একজন মহিলা যেকয়টি সন্তানের জন্ম দেয় তা হল সামগ্রিক জন্মহার। আর বয়স অনুসারে জন্মহার - বয়স ভিত্তিক মহিলাদের সন্তান সংখ্যাকে বোঝায়। সামগ্রিক জন্মহার ৫.২ (১৯৭১) থেকে কমে দাঁড়ায় ৩.৫ (১৯৯৫)। এই হ্রাস শহর এবং গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এবং ঐ একই সময়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৪ শতাংশ হ্রাস পায়। তবে ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক জন্মহার সামান্য বৃদ্ধি পায়।

লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক শিক্ষার হার

বয়স	১৯৬১			১৯৮১			১৯৯১		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৫-১৯	৫২.০	২৩.৮	৩৮.৪	৬৬.১	৪৩.৩	৫৫.৪	৭৫.৩	৫৪.৯	৬৫.৮
২০-২৪	৪৯.৮	১৮.২	৩৩.৬	৬৬.৬	৩৭.১	৫২.০	৭১.৫	৪৩.৮	৫৭.৮
২৫-৩৪	৪২.৫	১৩.৯	২৮.৫	৬০.৭	২৮.৯	৪৫.১	৬৪.৭	৩৬.৬	৫০.৮

উৎস রেজিস্ট্রার জেনারেল অব্ ইন্ডিয়া ঃ

শিক্ষা মানুষকে ভালোমন্দ বিচার করতে শেখায়। সাক্ষরতা বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষা জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে সব রাজ্যে মহিলা শিক্ষার হার কম সেখানে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং শিশুমৃত্যুর হার বেশি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায় অর্ধেক ভারতবাসী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ শিক্ষিতা। যুবকদের মধ্যে শিক্ষার হার কম থাকলে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প শিক্ষার ফলে বেকারত্ব বাড়ে এবং যুবকরা অল্প পারিশ্রমিককে অদক্ষ কাজ করতে বাধ্য হয়। এখান থেকে তাদের মনে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি

উচ্চশিক্ষার ফলে দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা বাড়ে। স্নাতক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১.৬ মিলিয়ন (১৯৭১) থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালে ৪.৯ মিলিয়ন হয়। অর্থাৎ প্রায় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। স্নাতকোত্তর, ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক্ এবং পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই ধারা বিদ্যমান।

বেকারত্বের হার

সমস্ত মানুষকে কাজ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সরকারের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ এলাকায় ২ শতাংশ পুরুষ ও ১.৪ শতাংশ মহিলা এবং শহর এলাকায় ৪.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৮.২ শতাংশ মহিলা বেকার ছিল। গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব কম থাকার কারণ অনেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে তারা অর্ধ-বেকার। মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি হ্রাস পায়। এই চিত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ক্রমশ বেশি অংশগ্রহণকে সূচিত করে। শহর এবং গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বেকারত্বের হার কম।

বিভিন্ন শিল্প অনুসারে প্রধান কর্মীদের বিন্যাস

যেহেতু ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর তাই প্রায় ৮১ শতাংশ মহিলা এবং ৬৬ শতাংশ পুরুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখানে প্রায় ৪৩.৭ শতাংশ পুরুষই কৃষক অর্থাৎ নিজের জমি চাষ করে। আর মহিলাদের ৪৬.১৮ শতাংশ কৃষি শ্রমিক। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পুরুষদের সংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ কমে যায় এবং অন্য ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের সংখ্যা দ্বিতীয় স্তরের কর্মক্ষেত্রে ১ শতাংশ কমে এবং তৃতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যা

দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার চাপ মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে। যেহেতু যুবকরা বেশি করে আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয় তাই তাদের বেশি করে এই চাপ সহ্য করতে হয়। যারা এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৫ সালে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ৩৬৮২১ যা পুরুষ আত্মহত্যাকারীর সংখ্যার তুলনায় ৭০ শতাংশ কম। পরিবেশের সঙ্গে মহিলাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার অধিকতর ক্ষমতার জন্য হয়তো তাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা কম। কিনউত ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবতীদের মধ্যে এই পার্থক্য খুব বেশি নেই। পণ সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক সমস্যা, প্রণয় ঘটিত সমস্যা এবং নিঃসন্তানের কারণে এই বয়সে অনেকে আত্মহত্যা করে।

৫.৩ সরকারি যুব-কল্যাণ প্রকল্প

আমরা জানি ভারতবর্ষে সমাজ কল্যাণের অঙ্গ হিসাবে যুব কল্যাণের অন্তর্ভুক্তি হাল আমলের ঘটনা। কয়েক বছর আগেও জাতীয় স্তরে সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত কোন সরকারি পরিষেবা ছিল না। বে-সরকারি সংস্থাগুলিও তেমন কোন চেষ্টা করে নি। এমনকি বর্তমানেও অনেক যুবক জীবিকা অর্জনের কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার ফলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া জগৎ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা ছাড়াও তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং নিজেদের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পায় না। সত্তরের দশকে অন্য দেশের মতো ভারতেও ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি প্রকল্প চালু হয়েছিল। অনেক বেসরকারি সংস্থাও যুবকল্যাণে নিযুক্ত ছিল।

এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল যেমন–

(ক) যুবকদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণ।

(খ) আই. ওয়াই. ওয়াই. এর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কিছু নতুন প্রকল্প চালু।

(গ) যুব উৎসব, হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, নাট্যোৎসব, ফটো প্রদর্শনী, সেমিনার, সচেতনতা, যুব দিবস উদ্‌যাপন।

(ঘ) শিক্ষার জন্য যুবকদের ভ্রমণ বা বিনিময়।

(ঙ) অধিকতর যুবক-যুবতীর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(চ) যুবকদের আইনী সুরক্ষা।

(ছ) বিভিন্ন স্তরে পরামর্শদান পরিষেবা।

(জ) কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় নিয়োগ বা স্ব-নিযুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

(ঝ) যুবকদের সৃজনশীল কাজে যুক্ত করা।

(ঞ) যুব কল্যাণে সরকারি সম্পদের ১০ শতাংশ বরাদ্দ। এবং

(ট) এইভাবে জাতীয় উন্নয়নের সাথে যুবকদের যুক্ত করা।

যুবকরাই যেকোন দেশের প্রকৃত সম্পদ। স্বভাবতই এদের কল্যাণে সরকারের বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারা যদি সৃজনশীল ও প্রগতিশীল হয় তবে দেশেরও অগ্রগতি হবে। যেকোন দেশের যুব কল্যাণ প্রকল্পের দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত - প্রথমতঃ ঐ প্রকল্প যুবকদের বিকাশ ঘটাবে এবং দ্বিতীয়ত, তাদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে জাতীয় যুব নীতি ঠিক করা হয়েছে। যুবকরা যাতে দেশের কাজে লাগতে পারে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার দুটি বিশেষ কর্মসূচি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ-

(১) জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন. এস. এস.),

(২) নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন,

(৩) জন শিক্ষণ সংস্থান,

(৪) ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ আন্দোলন,

(৫) ন্যাশন্যাল্ ক্যাডেট্ কোর্ (এন.সি.সি.),

(৬) রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ইনস্টিটিউট অব্ ইউথ্ ডিভেলপমেনট্,

(৭) স্পোর্টস্ অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (সাই)

(১) জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন.এস.এস.)

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্প। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে-নাতে কিছু কাজ করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে যুক্ত হওয়ার ধারণা পাবে। গান্ধিজীর মতে যুবকরা যাতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে

পারে এবং জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে তার জন্য কিছু সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। জঃ রাধাকৃষ্ণানও ছাত্ররা যাতে স্বেচ্ছায় সমাজসেবার কাজে যুক্ত হতে পারে তার সুপারিশ করেন। ১৯৫৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মুখ্যমন্ত্রীদের লিখিত নির্দেশ দেন যে স্নাতক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই সমাজসেবার কাজে যুক্ত করতে হবে। ড. ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশনও শিক্ষার সাথে সমাজ সেবাকে যুক্ত করার কথা বলে। উপাচার্যগণ ১৯৬৭ সালের সম্মেলনে এই সুপারিশকে স্বাগত জানান। পরিশেষে ১৯৬৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি.কে.আর.ভি. রাও এই প্রকল্প শুরু করেন।

১৯৬৯ সালে প্রায় ৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮০-৮১ সালে সংখ্যাটি বেড়ে ৪.৭৫ লক্ষ এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৩.৫২ লক্ষ হয়। বর্তমানে সংখ্যাটি প্রায় ১৫ লক্ষ। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্ররা যে কোন গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যবিধান, টীকাকরণ, সাক্ষরতা, সচেতনতা শিবির, রক্তদান শিবির, রোগী, প্রতিবন্ধী, অনাথ ব্যক্তিদের সাহায্য, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নির্মূল এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং একতার লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

জাতীয় সমাজ সেবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- যে এলাকায় তারা কাজ করবে সেই এলাকার পরিস্থিতি ও জনসমষ্টিকে সঠিক ভাবে জানা;
- নিজেদের সমাজের সাপেক্ষে নিজেদের জানা;
- এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমস্যা সমাধানের কাজে সামিল হওয়া;
- তাদের মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা;
- এলাকার জনগণকে কাজে সামিল করার পদ্ধতি শেখানো;
- গোষ্ঠী জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা;
- নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অর্জন;
- আপদ্‌কালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষমতা;
- ব্যক্তি ও এলাকার সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের ব্যবহার।

(২) নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন

নেহেরু যুবকেন্দ্র সংগঠন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক স্বতন্ত্র সংস্থা। সমস্ত জেলাতে এর কার্যালয় রয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র নয় এমন যুবকদের জন্য কর্মরত সর্ববৃহৎ সংস্থা হল নেহেরু যুব কেন্দ্র। প্রায় ২ লক্ষ ক্লাব এবং ৮ লক্ষ যুবক এর সাথে যুক্ত। এই সংগঠনের মাধ্যমে মূলত সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রামের উন্নয়নে যুবকদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, এইচ.আই.ভি./এডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, পরিবেশ উন্নয়ন, শিশুর অধিকার, নারী ক্ষমতায়ন, সাক্ষরতা ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বা বিষয় সমুহের উন্নতির জন্য ক্লাবের মাধ্যমে গ্রামে কাজ করা হয়। বর্তমান সময়ে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– চামেলিতে ঘটা ভূমিকল্প, উড়িষ্যায় ঘটা প্রবল ঝড় ইত্যাদির মোকাবিলায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার মতো কাজও তারা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান কেবল একটি সংগঠন নয় যুব আন্দোলনের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

(৩) জন শিক্ষণ সংস্থান

জন শিক্ষণ সংস্থান হল একটি বহুমুখী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র যার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর এবং প্রবহমান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় বেশ কিছু বে-সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি রাজ্য সরকার সরাসরি এই প্রকল্প রূপায়িত করছে। ২০০৬ সালের মার্চ মাসের শেষে দেখা যাচ্ছে মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, পণ্ডিচেরী, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাদে সারা দেশে ১৭২টি জন শিক্ষণ সংস্থান কাজ করছে।

এই সংস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার চাহিদা অনুসারে কর্মসূচি রূপায়ণ
- সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ
- প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি
- নিরক্ষর, নবসাক্ষর ও স্বল্প সাক্ষর মানুষদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য জেলা সাক্ষরতা সমিতিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান
- প্রবহমান শিক্ষার নোডাল কেন্দ্র হিসাবে সংযোজনা সহ প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র তদারকি ও নজরদারীর কাজ
- প্রবহমান শিক্ষার অধীনে নবসাক্ষরদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য রিসোর্স পার্সন বা অনুপ্রেরকদের জন্য প্রশিক্ষণ
- জাতীয় লক্ষ্য পূরণ যেমন – ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কর্মসূচি।

লক্ষ্যদল

- শিল্প শ্রমিক ও পরিবার তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি
- আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ
- নিরক্ষর, নব-সাক্ষর, মহিলা, প্রতিবন্ধী, তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ

কর্মসূচি

মোট চার ধরনের কর্মসূচি আছে

- শিক্ষা সংক্রান্ত

- সাক্ষরতা সম্বন্ধীয়
- বৃত্তিমূলক
- স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন ও পরিচালনা করা

প্রকল্প এলাকা

- শহর বিশেষ করে বস্তি এলাকা
- শিল্পাঞ্চল
- গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া এলাকা

এইভাবে জন শিক্ষণ সংস্থান যুবক যুবতীদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধি, শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধির কাজ গুরুত্ব সহকারে করছে। যার ফলে তাদের সামনে স্বাবলম্বন ও চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ বাড়ছে। সারা দেশে ৬ লক্ষের বেশি যুবক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

(৪) ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ আন্দোলন

যুব কল্যাণের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থা মূলতঃ চরিত্রের গুণগত মান যেমন – আত্মশৃঙ্খলা, স্বাবলম্বন, দেশপ্রেম এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ার ব্যাপারে যত্নবান। এর দুটি শাখা (১) বালকদের জন্য স্কাউটস্ এবং (২) বালিকাদের জন্য গাইডস্। স্কাউটস্ এন্ড্ গাইডসের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে তিনটি মন্ত্র বা নিয়ম মেনে চলতে হয়–

(ক) ঈশ্বর এবং দেশের জন্য কর্তব্য করা

(খ) স্কাউটস্ এন্ড্ গাইডসের নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা

(গ) অপরের প্রয়োজনে সাহায্য করা

প্ল্যানিং কমিশনের মতে এই আন্দোলন যেন রাজ্য, স্থানীয় সরকার ও এলাকার জনগোষ্ঠীর সমর্থন পায় তা দেখতে হবে।

(৫) ন্যাশন্যাল্ ক্যাডেট্ কোর্ (এন.সি.সি.)

যুব কল্যাণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সারা দেশে এই প্রকল্প চালু করার জন্য ১৯৪৮ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রকল্প চলছে। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে –

১) চরিত্র গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং বালক বালিকাদের মধ্যে সেবার মনোভাবে তৈরি,

২) তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা প্রয়োজনে দেশের সুরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১৩ থেকে ২৬ বছরের যুবকরা এই প্রকল্পে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা নেতৃত্ব বিকাশের এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায়।

(৬) রাজীব গান্ধী ন্যাশন্যাল্ ইনস্টিটিউট অব্ ইউথ্ ডিভেলপমেনট্

এই সংস্থা যুব কল্যাণ প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি, নীতি ও রূপায়ণে কৌশল স্থির করার কাজে নিযুক্ত। এখানে, যুব-কল্যাণের কাজে পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রয়োগমুখী গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান এমন একটি মঞ্চ যেখানে যুবকরা তাদের সমস্যা এবং যে বিষয়গুলি তাদের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনা করার সুযোগ পায়।

(৭) স্পোর্টস্ অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া (সাই)

দেশের সর্বত্র খেলাধূলার প্রসার ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ) সৃষ্ট একটি সংস্থা। সাই খেলাধূলার মানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন খেলাধূলার উপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। তারা প্রতিভারও অন্বেষণ করে। সাই-এর এই সকল প্রচেষ্টার ফলে এবং সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশান, ভারতীয় হকি এসোশিয়েসান, বি.সি.সি.আই. টেবিল টেনিস, কবাডি এসোশিয়েসন এর উদ্যোগের ফলে দেশে খেলাধূলার মানের কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। খেলোয়াড়রা স্কলারশিপ্ সহ বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে।

যুব কল্যাণের বিভিন্ন প্রকল্প

(১) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব

(২) যুবকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

(৩) যুব হোস্টেল

(১) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব

যুবকদের মধ্যে প্রতিভার বিকাশের উদ্দেশ্যে এরূপ উৎসবের আয়োজন করা হয়। যুবকরা এই উৎসবের মাধ্যমে নিজেদের মানসিক, আবেগঘন, রুচিবোধ সংক্রান্ত সৃজনশীল ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পায়। নাটক আবৃত্তি, বাজনা, বিতর্ক, অঙ্কন, ফটোগ্রাফি, শিল্পকলা, লোকনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। তারপর থেকে নিয়মিত এরূপ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

(২) যুবকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

এরূপ কর্মসূচি শৃঙ্খলা, দক্ষতা অর্জন, ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা, জ্ঞান ও দেশপ্রেম বিকাশে সাহায্য করে। এরূপ ভ্রমণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বা ছাত্র সংস্থা সরাসরি আয়োজন করতে পারে। সঠিকভাবে আবেদন করলে রেলে ভ্রমণের সুবিধা এবং আর্থিক সহায়তাও পাওয়া যায়।

(৩) যুব হোস্টেল

দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু যুব হোস্টেল রয়েছে। যুব হোস্টেল এসোসিয়েশন্ এই হোস্টেলগুলি পরিচালনা করে। নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীতে কেন্দ্রীয় যুব হোস্টেল অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরে যুব হোস্টেল রয়েছে। যুবকদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে উৎসাহ দান এবং তার মাধ্যমে সংহতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরূপ হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪ বে-সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার যুব কল্যাণ প্রকল্প

বে-সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, চেম্বার অব্ কমার্স, শিল্প সংস্থা, লায়নস্ ক্লাব, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি সংস্থা যুব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনেক সংস্থা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তারা গ্রন্থাগার পরিচালনা, জিম বা ব্যায়ামাগার, কোচিং, মিউজিক ট্রেনিং, অঙ্কন, আবৃত্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করে।

বে-সরকারি সংস্থা যুবকদের জন্য সরাসরি শিক্ষা, সাক্ষরতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা শিবির, স্ব-নির্ভর মহিলাগোষ্ঠী গঠন, অর্থনৈতিক কর্মসূচি, পরামর্শদান এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তাছাড়া অন্ধ, মূক-বধির, বন্দী অপরাধী, যৌন কর্মী ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যও নানান কর্মসূচি রূপায়ণ করে।

শিল্প সংস্থাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় টাটা স্টিল গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষ করে যুবকদের উন্নয়নের কাজে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। টাটা গোষ্ঠী জামসেদপুরে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিভাবান যুবকরা ফুটবলের প্রশিক্ষণ পায়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকে দেশের নামী ক্লাবগুলিতে খেলছে।

চেম্বার অব্ কমার্সও যুবকদের উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মেড্রাস মানেজমেন্ট এসোশিয়েশন্ ম্যানেজারদের জন্য প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, প্রকল্প তৈরি, যুব নেতৃত্ব, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দিল্লীতে অবস্থিত পি.এইচ.ডি. চেম্বার অব্ কমার্স সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান যুবকদের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছে।

এইভাবে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেশ কিছু অন্যান্য সংস্থা যুবক যুবতীদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত।

৫.৫ যুবকল্যাণে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

যুব কল্যাণের কাজে সমাজ কর্মীরা নিম্নলিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে –

- যুবকদের নিজস্ব সংগঠন গড়া এবং তার মাধ্যমে যুবকদের ও এলাকার উন্নয়ন,
- যুবকদের সমস্যা নিরূপণ এবং তার সমাধানের পথ তৈরি,
- সাক্ষরতা ও প্রবহমান কর্মসূচি রূপায়ণ,
- জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি রূপায়ণ,
- পরামর্শদান,
- দক্ষতাবৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত সংস্থা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান,
- পরিস্থিতির প্রয়োজনে উপদেশ প্রদান,
- ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাতে যুবকদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ডিভেলপিং ইউথ্ ওয়ার্ক – মার্ক স্মিথ

(২) ন্যাশন্যাল্ সার্ভিস স্কীম্ ম্যানিউয়্যাল্ – মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

(৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ইউথ্ কন্ভেন্শন্ সুভেনিয়ার

(৪) প্রিন্সিপ্লস্ এন্ড্ প্র্যাকটিস্ অব ইউথ ইন ডিভেলপমেন্ট ওয়ার্ক – কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট

(৫) এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ সোস্যাল্ ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া – সমাজ কল্যাণ দপ্তর, ভারত সরকার

৫.৭ অনুশীলনী

(১) সরকারি যুবনীতির মূল বিষয়গুলি কী কী? এই নীতি কারা কার্যকরী করছেন?

(২) যুব কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পগুলি আলোচনা করুন।

(৩) যুব কল্যাণে বে-সরকারি সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(৪) যুব কল্যাণে সমাজকর্মীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৬ অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

গঠন

৬.১ আদিবাসী কল্যাণ

৬.১.১ ভূমিকা

৬.১.২ ধারণা/সংজ্ঞা

৬.১.৩ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য

৬.১.৪ মূল সমস্যা

৬.১.৫ আদিবাসী কল্যাণে সরকারি প্রকল্প

৬.২ তপশিলি জাতির কল্যাণ

৬.২.১ ধারণা

৬.২.২ জনসংখ্যার চিত্র

৬.২.৩ তপশিলি জাতির সমস্যা

৬.২.৪ তপশিলি জাতি কল্যাণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রকল্প

৬.২.৫ দলিত আন্দোলন

৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

৬.৪ মন্তব্য / মতামত

৬.৪.১ তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির পরিবর্তন

৬.৪.২ বে-সরকারি সংস্থা ও সমাজকর্মীদের ভূমিকা

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৬.৬ অনুশীলনী

৬.১ আদিবাসী কল্যাণ

ভারত সহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। তাদের জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে বৈদিক এমন কি প্রাক্ বৈদিক সময় থেকে তারা আছে। রামায়ণেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে

এদের সংখ্যা বা বিন্যাস বিভিন্ন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীরে এদের সংখ্যা নগণ্য। আবার ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল এবং গুজরাটের মতো রাজ্যে এদের সংখ্যা খুব বেশি। রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় এদের বিন্যাস আবার একই রকম নয়। কোথাও খুব বেশি আবার কোথাও খুব কম। কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত অভ্যাস, রীতিনীতি মেনে চলে আবার কিছু সম্প্রদায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তা সত্ত্বেও আদিবাসীরা ভাষা, সংস্কৃতি ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাসের দিক থেকে স্বতন্ত্র।

৬.১.২ ধারণা / সংজ্ঞা

নৃতত্ত্ববিদরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি প্রয়োগ করে। আদিবাসী হল সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠী যাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। তারাই প্রকৃতপক্ষে আদি বাসিন্দা। তাদের প্রায় 'আদিম' জনগোষ্ঠী, 'সরল' জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয়। হোবেলের মতে 'আদিবাসী' হল এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এরা রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত হওয়া কোন গোষ্ঠী নয়। পেডিংটনের মতে আদিবাসী হল এমন জন সম্প্রদায় যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু 'আদিবাসী' শব্দটির নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। সেই জন্য তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে পরিচিত। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

- সম্পদের দিক থেকে তারা খুবই গরীব
- বিচ্ছিন্ন এলাকা বিশেষ করে পাহাড়-জঙ্গালে বসবাস করে
- নিজস্ব ভাষা রয়েছে
- সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আচ্ছাদিত (ছাউনিযুক্ত) বাড়ি
- বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে
- স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে ভালোবাসে
- নিজস্ব রীতি-নীতি বা নিয়ম কানুন রয়েছে
- নিজস্ব গোষ্ঠীর প্রতি গভীর অনুরাগ এবং চিরাচরিত নেতৃত্বের উপর আস্থা রয়েছে
- কুকুর সহ অন্যান্য পশুপাখি লালন পালন করতে ভালোবাসে
- একতা রয়েছে
- এরা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী
- নিজস্বতা রয়েছে

৬.১.৩ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে বেশ কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল –

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
০১.	চেঞ্চু	অন্ধ্রপ্রদেশ	খর্বাকৃতি, খুব কালো চামড়া, কোঁকড়ানো চুল, চওড়া মুখমণ্ডল, চ্যাপ্টা নাক, একক পরিবার, ছেলে বা মেয়ে নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন ব্যাপার নেই, মহিলাদের উপর অত্যাচার বা বল প্রয়োগ অনৈতিক, পূর্বে তারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত, অন্যান্য আদিবাসী থেকে স্বতন্ত্র।
০২.	আপা তানিস, টোডাস্	অরুণাচল প্রদেশ	বড় বড় ঘন বসতি গ্রাম, কৃষি মূল জীবিকা, প্রতিটি জমি যত্ন সহকারে ব্যবহার করে, ধানই প্রধান শস্য, বাজরা, ভুট্টা, আলু এবং সব্জি চাষও করে, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, পুরোহিত প্রথা বিদ্যমান জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।
০৩.	টোডাস্ কোটাস	তামিলনাড়ুর নীলগিরি পর্বত	বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস, স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহ প্রথা, এমন কি শ্বশুরের ছোট ছেলে যে পরে জন্মেছে সেও বড়ভাই এর স্ত্রীর স্বামী হতে পারে, ব্রুস-কাজ্নদের মধ্যে বিবাহ, ব্যভিচার নিষেধ, সোরোরিটি প্রথা।
০৪.	নিশি	অরুণাচল প্রদেশ	'বন্য মানুষ' বলে পরিচিত, ৪০ হাজারের বেশি জনসংখ্যা, নিরাপত্তার কারণে একটি বাড়িতে অনেক পরিবারের বসবাস, জঙ্গল পুড়িয়ে চাষবাস (স্লেস এন্ড্ বার্ণ্), ঝুম, প্রথায় চাষ, লাঙ্গালের ব্যবহার নেই, বাল্য বিবাহ, বহু-বিবাহ, সভা করে শান্তি বজায় রাখা।
০৫.	আবর	অরুণাচল প্রদেশ	বিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তা, প্রেম করে বিবাহ একমাত্র পদ্ধতি।

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
০৬.	মোনপাস্	অরুণাচল প্রদেশ	বৌদ্ধ - প্রায় ৩০ হাজার জনসংখ্যা, ভুটান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, পাহাড়ের উচ্চ এলাকায় বসবাসকারী, বার্লি এবং গম মূল শস্য।
০৭.	খোভাস্	অরুণাচল প্রদেশ	ছোট্ট গোষ্ঠী, অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে বিবাহ হয় না, বহু দেব-দেবীর পূজা, স্লেস এন্ড বার্ণ পদ্ধতিতে চাষ।
০৮.	চাকেসাং আও, সেমা	নাগাল্যান্ড	প্রত্যেকের মধ্যে কিছু শ্রেণি আছে, একই শ্রেণির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, মামার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ চলতে পারে, একই গ্রামে বিবাহ, প্রেম ঘটিত বিবাহ নিষিদ্ধ।
০৯.	পুচুরী, আঙ্গামী	নাগাল্যান্ড	পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ঝুম প্রথায় চাষ।
১০.	লোথা চেং	নাগাল্যান্ড	নানা রঙের পোশাক, চাষের সময় এবং ফসল তোলার সময় নাগা নৃত্য, ধান, কলা, কমলা লেবু, পেয়ারা, সোয়াবীন, ওল, লঙ্কা, বেগুন চাষ, মহিলারা তাঁত, উলবোনা, চাষবাস এবং গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত, পুরুষেরা বাঁশ ও কাঠের কাজ, কামারের কাজ, চাষবাস করে।
১১.	সাঁওতাল	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড	একতা, নাচ-গান প্রিয়, শিকার অবশ্যই করতে হবে, দেশী মদের ব্যবহার, অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৎ, পরিশ্রমী।
১২.	লোধা	পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড	সম্পূর্ণ আলাদা থাকে, ব্রিটিশরা ক্রিমিন্যাল ট্রাইব হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, ভূমিহীন, বর্তমানে কাজের সন্ধানে অন্য গ্রামে যাচ্ছে, তাদের সততার ব্যাপারে এখনো মানুষের সন্দেহ রয়েছে।
১৩.	বাঞ্জারা	অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র,	যাযাবর জাতি, স্থায়ী অর্থনীতি নেই এবং স্থায়ী সম্পত্তি নেই, কিছু হস্তশিল্পে পারদর্শী।
১৪.	গারো	মেঘালয়, আসাম	আসামের আদিবাসীদের ৬৬ শতাংশ। মেঘালয়েও এদের সংখ্যা অনেক, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ম্যারেজ বাই ক্যাপচার, বিয়ের পূর্বে একত্রে বসবাস

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
			এবং পরবর্তীকালে পলায়ন ও বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা, তাঁত, পোল্ট্রি, পশুপালন, ধান ও ভুট্টা চাষ, শুকনো মাছ, প্রায় সমস্ত পশু-পাখির মাংস, ভাত এবং রাইস্ বিয়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৫.	খাসা	উত্তরাঞ্চলের দেরাদুন, নীলগিরি পর্বত	লেভিয়েট প্রথা, বড়ভাই পরিচালনা করে, বিবাহের বাইরেও সম্পর্ক অনুমোদিত, পুরুষদের তুলনায় মহিলার সংখ্যা খুবই কম।
১৬.	নায়েক	হিমালয় সংলগ্ন	বিবাহ সংক্রান্ত কোন প্রথা নেই, মুক্ত যৌন মিলন, পণপ্রথা, মহিলাদের আয়ের উপর পুরুষরা নির্ভরশীল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক।
১৭.	নাইরস্		মহিলাদের বহুবিবাহ, ক্রস-কাজ্ন ম্যারেজ, পিতার মর্যাদা কম, মেয়েরা প্রাপ্তবয়স হলে অনুষ্ঠান করে ভোজন বিবাহিত জীবনের বন্ধন গভীর নয়।
১৮.	আহম্	আসাম	স্ত্রী বিনিময়
১৯.	ওয়ানচু	অরুণাচল প্রদেশ	নাগাল্যান্ড্ থেকে অনুপ্রবেশ, আসামের সমতলে বসবাসকারীদের সঙ্গে নিবিড় ব্যবসায়িক সম্পর্ক।
২০.	মিইটি	মণিপুর	মণিপুরের আদিবাসীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ, নৃত্যপ্রিয়, পৃথক ভাষা।
২১.	কোন্ডা, রেডিস	অন্ধ্রপ্রদেশ	পাহাড়ে বসবাস, ৪৩০০০ হাজার জনসংখ্যা, ঝুম প্রথায় চাষ, ভুট্টা ও বজরা চাষ।
২২.	গণ্ড, মারিয়া গন্ড, হিল মারিয়া	মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা এবং ছত্রিশগড়	৪০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা, বলদ ও লাঙ্গালের ব্যবহার, অনেকে রোটেশান পদ্ধতিতে চাষ করে, প্রধানই অভিভাবক, এক বিশেষ দেবীর পূজা (পার্সা পেন)।
২৩.	সবর	অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড	পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গালে বাস করে। পাঁচ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা। লম্বা রাস্তার ধারে মুখোমুখি বাড়ি, স্লেস এন্ড্ বার্ণ পদ্ধতিতে চাষ, ধান ও অন্যান্য ফসল ফলায়।

ক্রমিক নং	নাম	রাজ্য বা অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২৪.	সেদ্রুকপেন	অরুণাচল প্রদেশ	খুবই ছোট গোষ্ঠী, মাত্র দুটি এলাকায় বসবাস করে, আসামের সমতলে বসবাসকারীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক, দু-ধরনের ধর্মাচরণ-প্রাচীন-চিরাচরিত এবং বৌদ্ধ স্থানান্তরিত এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চাষ।
২৫.	খাসি	আসামের পার্বত্য এলাকা, মেঘালয়	মাতৃতান্ত্রিক, রাস্তার দু-ধারে ঘর, মেয়েরা স্বামী নির্বাচন করে, বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, বিধবা বিবাহ অনুমোদিত, ভাত, শূকরের মাংস, গো-মাংস, শুকনো মাছ খুবই জনপ্রিয়, চাষবাস (ঝুম), পশুপালন, মৌমাছি পালন, বাঁশ ও বেতের কাজই প্রধান পেশা।
২৬.	বোরো	আসাম	আসামের জনসংখ্যার অনেকটাই বোরো জনগোষ্ঠী, ভিলেজ কাউন্সিল আছে, প্রধান ব্যক্তি গাঁ-বুড়া নামে পরিচিত, পিতৃতান্ত্রিক, যৌথ পরিবার, পাঁচ প্রকার বিবাহ রীতি – পণ নেই, বিবাহ বিচ্ছেদ খুব একটা দেখা যায় না। কৃষি, পশুপালন এবং বাঁশের কাজই মানুষের প্রধান পেশা।
২৭.	কারবি	আসাম	পিতৃতান্ত্রিক ভিলেজ কাউন্সিল, কৃষি প্রধান পেশা, প্রধানতঃ একবার বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত, ক্রস-কাজন ম্যারেজ পছন্দ, ছোট্ট গ্রাম, খাদি শিল্প।
২৮.	কোন্ধা	উড়িষ্যা	বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তিনটি ভাগ রয়েছে, যুবকদের জন্য একত্রে বাসস্থান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, প্রচলিত কৃষি, পশুপালন এবং জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ।
২৯.	ওরাঁও	উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড	ছেলেদের জন্য জনক্ষেপা এবং মেয়েদের জন্য প্লেডাপা বাসস্থান, কম বয়সে বিবাহ, ছোট ছোট বাড়ি, ভাত, বাজরা, ডাল প্রধান খাদ্য, স্থায়ী এবং স্থানান্তরিত দু-ভাবেই চাষ।

তাছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে যেমন–

- অন্ধ্রপ্রদেশের - কয়য়া
- মধ্যপ্রদেশ - বিসন্ হোরঁ মারিয়া
- ঝাড়খণ্ডে - মুন্ডা
- ত্রিপুরায় - চাকমা
- অরুণাচলে - আপাতানি
- নাগাল্যান্ডে - নাগা
- ঝাড়খন্ডে - বীরহোড়
- বিহার এবং ঝাড়খন্ডে - হো
- মিজোরামে - মিজো
- অরুণাচলে - আকাশ

ইত্যাদি।

জনসংখ্যার চিত্র

২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে আদিবাসী জনসংখ্যা ৮,৪৩,২৬০০০ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.২০ শতাংশ। তারা দেশের ১৫ শতাংশ জমিতে বসবাস করে। নিম্নলিখিত রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে তপঃউপজাতি মানুষের সংখ্যা অধিক–

১)	লাক্ষাদ্বীপ	৯৪.৫১%
২)	মিজোরাম	৯৪.৪৬%
৩)	নাগাল্যান্ড	৮৯.১৫%
৪)	মেঘালয়	৮৫.৯৪%
৫)	অরুণাচল প্রদেশ	৬৪.২২%
৬)	দাদরা নগর হাভেলি	৬২.২৪%

অন্যান্য কিছু রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলেও আদিবাসী জনসংখ্যা বেশি। মনিপুরে ৩৪.২০ শতাংশ, ত্রিপুরায় ৩১.৫, ছত্রিশগড়ে ৩১.৭৬, ঝাড়খন্ডে ২৬.৩০, উড়িষ্যায় ২২.১৩ এবং মধ্যপ্রদেশে ২০.২৭ শতাংশ। আবার পন্ডিচেরী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, চন্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম। ঐ সকল রাজ্যে মাত্র ০ থেকে ১.১৪ শতাংশ আদিবাসী। পশ্চিমবঙ্গে ৫.৫০ শতাংশ আদিবাসী।

৬.১.৪ মূল সমস্যা

আদিবাসীরা সর্বদা অনুন্নত সম্প্রদায় বলে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের মূল সমস্যাগুলি নিম্নরূপ –

(১) শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

শত শত বছর ধরে বিভিন্ন শক্তি আমাদের দেশকে শাসন করেছে। তারা শিক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে যত্নবান ছিল না। বিশেষ করে আদিবাসীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশরা মিশনারীদের সহায়তায় কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এর সুবিধা পায়। ফলস্বরূপ, তাদের বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর থেকে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি ঘটে। আদিবাসী এলাকায় স্কুল স্থাপন করা হয়, সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করা হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, বৃত্তি ইত্যাদি চালু করা হয়। এই সব পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু, বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে দেশের নিরক্ষর এবং স্কুল-ছুটদের অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। অপ্রতুল পরিকাঠামো, মানসিকতার অভাব, তাদের মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা না থাকা, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ইত্যাদির ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না।

(২) অর্থনৈতিক সমস্যা

অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে। শত শত বছর ধরে তারা এরূপ সমস্যায় ভুগছে। এর প্রতিফলন ঘটে তাদের বসতবাড়ি, পোশাক, খাদ্য এবং সম্পত্তিতে। ভারতে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীর ৬৩ শতাংশ আদিবাসী। স্থানান্তরিত ও ঝুম প্রথায় চাষই তাদের মূল পেশা। তারা শিকার, খাদ্য সংগ্রহ এবং দিন মজুর হিসাবেও কাজ করে। বর্তমানে অনেকে দিনমজুরের কাজ করছে। তাদের আর্থিক অবস্থা কখনই সচ্ছল নয়। তাদের সম্পত্তি বলে তেমন কিছুই নেই।

(৩) যোগাযোগের সমস্যা

আদিবাসীরা সাধারণত পাহাড়-জঙ্গালে বসবাস করে। ঐ সব জনবসতি প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। ফলে মূল এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। রেডিও, টিভি, খবর কাগজও তারা পায় না। ফলে বৃহৎ জগৎ সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ।

(৪) স্বাস্থ্য সমস্যা

আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। শিশুরা অপুষ্টি এবং চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন রোগের শিকার। অধিকাংশ মহিলা প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন। টি.বি. এবং ম্যালেরিয়া প্রায় দেখা যায়। যেহেতু তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না তাই তাদের মধ্যে অধিক শিশুমৃত্যু, স্বল্প আয়ু, বিভিন্ন রোগ পরিলক্ষিত হয়। হাতুড়ে চিকিৎসক বা 'জান বুড়া' থাকার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো সহজসাধ্য হচ্ছে না।

(৫) মাদকশক্তির সমস্যা

আদিবাসীদের জীবন দেশী মদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত নয়। নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি মদ পান করা তাদের চিরাচরিত প্রথা ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। যা নেশা ও অস্বাস্থ্যের কারণ। বস্তুতপক্ষে মাদকাশক্তি তাদের আয়ু কমিয়ে দেয়।

(৬) সচেতনতার অভাব

বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, নিরক্ষরতা এবং রেডিও-টিভি-খবর কাগজের সুযোগ না থাকায় আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে নানান ধরনের কুসংস্কার, প্রথা, ওঝা-গুনিন নির্ভর চিকিৎসা, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, পশুপালন, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার মানসিকতার অভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সচেতনতা যে কোন সমাজের শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শক্তির অভাব রয়েছে। এমন কি অনেকে তাদের সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন নয়।

(৭) শোষণ

সমাজের মূলস্রোতের সাথে যুক্ত মানুষরা আদিবাসীদের শোষণ করে। তারা দিন-মজুর হিসাবে কাজ করলে তাদের সঠিক মজুরি দেওয়া হয় না। তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করলে দোকানদার বা ব্যবসায়ী কম পয়সা দেয়। যেহেতু তারা নিরক্ষর এবং অজ্ঞ তাই মানুষ তাদের সহজেই শোষণ করে। ফলে শত শত বছর ধরে আদিবাসীরা শোষণের শিকার।

(৮) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা

আদিবাসীরা চিরাচরিতভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তারা জীবিকার জন্য জঙ্গাল ও বনজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। এখন দিনের পর দিন জঙ্গাল এলাকা কমছে। এর জন্য আদিবাসীরাও কিছুটা দায়ী। তারা কাঠ বিক্রি করে এবং চাষের জমির জন্য জঙ্গালে আগুন ধরিয়ে দেয়। যা তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের চাষবাসও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু বৃষ্টি অনিয়মিত, তাই উৎপাদনও অনিশ্চিত। এইভাবে প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরশীলতা তাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৯) মৌলিক সুযোগ সুবিধার অভাব

অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কিছু মৌলিক বিষয় যেমন – বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন। আদিবাসীরা এ সব থেকে বঞ্চিত। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের সুযোগের অভাব রয়েছে। এরূপ মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার অভাব তাদেরকে আরো পশ্চাদপদ্ করে রেখেছে।

(১০) স্বীকৃতির অভাব

আদিবাসীরা অন্যদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তারা তাদের নিজস্ব এলাকায়, নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। এমন কি অনেক জায়গায় স্কুলে তারা আলাদা বেঞ্চে বসে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থাগুলির নানান প্রচেষ্টার ফলে তাদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনো অনেক কিছু করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সমাজকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.৫ আদিবাসী কল্যাণে সরকারি প্রকল্প

আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি পদক্ষেপ এখানে দেওয়া হল–

(১) ১৯৯০ সালের জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

(২) অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের প্রোটেকশান অব্ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট সংশোধন করা হয় ১৯৭৬ সালে।

(৩) সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়নের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটি অব্ পার্লামেন্ট গঠন করা হয়েছিল।

(৪) ১৯৮৯ সালে তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি মানুষদের বিরুদ্ধে অত্যাচার রদ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়।

(৫) আদিবাসী ছাত্রদের মাধ্যমিকোত্তর পড়াশুনার জন্য স্কলারশিপ্।

(৬) আশ্রম স্কুল প্রকল্প।

(৭) আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল।

(৮) যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কম সেইসব স্থানে ১৯৯৩-৯৪ সালে আদিবাসী বালিকাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়। এরূপ ৮টি রাজ্যে অবস্থিত ৪৮টি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা শনাক্ত করে কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে যেখানে আদিবাসী মহিলা শিক্ষার হার ১০ শতাংশের মধ্যে এরূপ ১৪টি রাজ্যের ১৩৬টি জেলায় কর্মসূচিটি চালু আছে।

(৯) আদিবাসী যুবকরা যাতে স্ব-নির্ভর হতে পারে, ব্যবসা করতে পারে বা চাকুরি পেতে পারে তার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে। ২০০৩-০৪ সালে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ২০০টি এরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১০) বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় গ্রামীণ শস্য গোলা স্থাপন করার প্রকল্প চালু হয়েছে। ট্রাইব্যাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেল্যাপমেন্ট ফেডারেশান অব ইন্ডিয়া এর জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে অর্থ প্রদান করে।

(১১) ভারত সরকার আদিবাসীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়, হোস্টেল, চিকিৎসা কেন্দ্র, লাইব্রেরী, বালওয়ার্ডি কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য বে-সরকারি সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

(১২) ট্রাইব্যাল ডেভেল্যাপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশান, ফরেস্ট ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশান, মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্ট ফেডারেশান মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্ট সংগ্রহ, বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ অর্থ পায়।

(১৩) আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৯৯ সালে পৃথক আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

(১৪) ২০০১ সালে ন্যাশন্যাল সিডিউলড্ ট্রাইবস ফিনান্স ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশনে গঠন করা হয়। ভারত সরকারের অধীনস্থ এই সংস্থার অংশীদারত্ব প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

৬.২ তপশিলি জাতি কল্যাণ

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় তপশিলি জাতি সম্বন্ধে বলা আছে। তারা অনগ্রসর বলে সংবিধানে তাদের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। দেশের প্রায় সর্বত্র তপশিলি জাতির মানুষ বাস করে। এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। তাদের উন্নতির জন্য সরকার ও বে-সরকারি সংস্থা বেশ খিচু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে তপসিলি জাতির ধারণা, তাদের জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করা হল।

৬.২.১ ধারণা

অনগ্রসর শ্রেণি বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়েপড়া শ্রেণির মানুষকে বোঝায়। বিশেষ করে বললে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির মানুষরাই অনগ্রসর। তাছাড়া আরো এক ধরনের মানুষ আছেন যারা পিছিয়ে। তাদেরকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির সঠিক সংজ্ঞা নেই। এমনকি ১৯৫৩ সালে গঠিত এই সংক্রান্ত কমিশনও পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। বস্তুতপক্ষে নানান কারণে এই শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন। যদিও নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় –

(ক) জাতিভেদ প্রথার স্তরবিন্যাস অনুসারে নিম্ন স্তরে অবস্থিত।

(খ) শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর।

(গ) সরকারি চাকুরিতে খুবই কম নিয়োগ।

(ঘ) ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে কম প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যারা শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে, সচেতন নয়, দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতার শিকার, ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন, মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এমন মানুষরাই অনগ্রসর শ্রেণি বলে পরিচিত।

৬.২.২ জনসংখ্যার চিত্র

কোন রাজ্যেই এরা অধিক সংখ্যায় নেই। তারা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬.২০ শতাংশ এবং আদিবাসী জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পাঞ্জাবে ২৮.৮৫, হিমাচল প্রদেশে ২৪.৭২, পশ্চিমবঙ্গে ২৩.৯২, উত্তরপ্রদেশে ২১.১৫, তামিলনাড়ুতে ১৯, উত্তরাঞ্চলে ১৭.৮৭, চণ্ডীগড়ে ১৭.৫০, রাজস্থানে ১৭.১৬, ত্রিপুরায় ১৭.৩৭, উড়িষ্যায় ১৬.৫৩, দিল্লীতে ১৬.৯২, কর্নাটকে ১৬.২০, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬.১৯, পন্ডিচেরীতে ১৬.১৯, বিহারে ১৫.৭২ এবং মধ্যপ্রদেশ ১৫.১৭ শতাংশ। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে এদের জনসংখ্যা খুবই কম যেমন– অরুণাচল প্রদেশে ০.৫৬, মেঘালয়ে ০.৪৮, গোয়াতে ১.৭৭, দাদরা ও নগর হাভেলিতে ১.৮৬,

দমন ও দিউতে ৩.০৬, মণিপুরে ২.৭৭ এবং সিকিমে ৫.০২ শতাংশ। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তপঃ জাতির মানুষ বাস করে না।

৬.২.৩ তপঃশিলি জাতির সমস্যা

তপঃশিলি উপজাতির সমস্যার সঙ্গে তপঃশিলি জাতির মানুষের সমস্যার অনেকটা মিল রয়েছে। এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এদের ভর্তির হার কম। অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান। একই গ্রামে বসবাস করলেও অন্যান্য জাতি থেকে সাধারণত দূরত্বে এরা বসবাস করে। এখনো দেশের অনেক গ্রাম আছে যেখানে তপঃজাতির মানুষরা নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে পারে না। পুকুরের ক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা ঘাট থাকে। বেকারত্ব খুবই প্রকট। যেহেতু তারা দক্ষ নয় তাই কাজের সুযোগ কম। চাষের ক্ষেত্রে কয়েকমাস ছাড়া আর কাজ পায় না। তারা শোষণের শিকার। ফলস্বরূপ তারা চরম দারিদ্রের শিকার। যার ভয়াবহ প্রভাব দেখা যায় তাদের বসবাসের গৃহে, খাদ্যাভ্যাসে, স্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায়। তারা অপুষ্টির শিকার। তাদের মধ্যে অনেক শিশুশ্রমিক রয়েছে। খোলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। সামাজিক পদমর্যাদায় নিম্নস্থানে। মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিশুমৃত্যুর হার অধিক। সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেকে আবার মাদকাশক্ত।

৬.২.৪. তপঃশিলি জাতির কল্যাণে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রকল্প

তপঃজাতি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হল–

(১) তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির সুরক্ষা, সমস্যা অনুধাবন, পরিকল্পনায় সাহায্য, সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য ন্যাশন্যাল কমিশন গঠন করা হয়েছে।

(২) ঝাড়ুদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ন্যাশন্যাল কমিশন ফর সাফাই কর্মচারী গঠন করা হয়েছে।

(৩) অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে প্রোটেকশান অব্ সিভিল রাইটস এক্ট্ চালু করা হয়েছে।

(৪) সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার রূপায়ণের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য প্যার্লামেন্টারী কমিটি বিভিন্ন সময়ে গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি নামে পরিচিত।

(৫) এদের বিরুদ্ধে অত্যাচার কমিয়ে আনার জন্য ১৯৮৯ সালে সিডিউলড্ কাস্ট ও সিডিউলড ট্রাইবস এক্ট্ চালু হয়েছে।

(৬) ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলি মাধ্যমিক ও পরবর্তী স্তরে শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ্ চালু করেছে।

(৭) কোচিং এবং ঐ সংক্রান্ত প্রকল্প চালু হয়েছে যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

(৮) আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের মেধা তথা সার্বিক বিকাশের চেষ্টা করা হয়।

(৯) তপঃ জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকারী ছাত্র-ছাত্রীরাও এরপ সুযোগ পায়।

(১০) তাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য স্পেশাল সেন্ট্রাল এডিস্ট্যান্স স্কিম চালু হয়েছে।

(১১) ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশান স্থাপন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে লাইব্রেরী, সামাজিক বিষয় অনুধাবনের জন্য পুরস্কার প্রদান এবং সংহতির উপর জোর দেওয়া হয়। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা আছে।

(১২) ১৯৯২ সালে নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রকের অধীনে স্কেভেঞ্জারদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্যও ১০০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

(১৩) ১৯৭৮-৭৯ সালে স্টেট্ সিডিউলড্ কাস্টস ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশন স্কিম চালু হয়েছে যার মাধ্যমে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের সহায়তা করা হয়। ২৬টি অঙ্গারাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। ভারত সরকার ৪৯ শতাংশ ও রাজ্য সরকার ৫১ শতাংশ ব্যয় করে।

(১৪) বে-সরকারি সংস্থা যেমন–রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর, পুরী, শিলচর এবং পুরুলিয়া শাখা, হরিজন সেবক সংঘ– দিলি এবং সার্ভেন্টস অব্ সোসাইটি, পুনা ভারত সরকারের সহযোগিতায় তপঃজাতির উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। বর্তমানে ৩৫০টির বেশি বে-সরকারি সংস্থা তপঃজাতির কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করছে।

এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প রয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্যও বেশ কিছু প্রকল্প রয়েছে। তাদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ন্যাশন্যাল্ কমিশন্ ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস গঠন করা হয়। যাদের পরিবারে বাৎসরিক আয় ৪৪,৫০০ টাকার কম তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাক্-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি প্রদান এবং ঐ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল চালু করার প্রকল্প শুরু করা হয়। ঐ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে চাকুরিতে নিয়োগের সুযোগবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু বে-সরকারি সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

৬.২.৫ দলিত আন্দোলন

অস্পৃশ্যতা অতীতকাল থেকেই রয়েছে। আর্য ও অনার্য (কৃষ্ণাঙ্গ) ভেদাভেদ করা হয়েছে। আর্যরা নিজেদের উচ্চ স্থানাধিকারী বলে মনে করে। বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রে গায়ের রং এবং চুলের রং অনুসারে স্তর বিন্যাস আমরা দেখতে পাই বেদ, পরাশর সংহিতা এবং ঋক্ বেদে। অনার্যরা অসুর বা অমানুষ ফলে পরিচিত।

পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম প্রথা শুরু হয়। চারটি বর্ণ আছে যেমন – (ক) ব্রাহ্মণ, (খ) ক্ষত্রিয়, (গ) বৈশ্য এবং (ঘ) শূদ্র।

শূদ্ররা দলিত বলে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই দলিত শব্দটি নতুন নয়। আপাতভাবে ১৯৩০ সালে মারাঠী ও হিন্দি অনুবাদে দলিত শ্রেণি কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। মিলিন্ড কলেজের মারাঠী অধ্যাপক পরবর্তীকালে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে এরা হল নিম্ন স্তরের মানুষ ফলে পরিচিত, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এবং হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা তপঃজাতি ও তপঃউপজাতি কথা দুটি ব্যবহার করে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে দলিত এবং অস্পৃশ্যরা অনেক সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ ও সামাজিক দিক দিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করতে পারে না যেমন – মন্দিরে প্রবেশ, কুঁয়ো বা পুকুর ব্যবহার ইত্যাদি। অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে আবার তথাকথিত উচ বর্ণের মানুষ দলিতদের ছায়া মাড়ায় না। সুতরাং দলিত – অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয়ভাবে হতে পারে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দলিতরা বিভিন্ন সময়ে সুপ্রাচীন কাল ধরে চলে আসা বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বর্তমানে দলিত বলতে সমান মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত এক সংগঠিত জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য বিভিন্ন সময় দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। জ্যোতিবা ফুলে, বি. আর. আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধী এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যে কোন ধরনের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বি. আর. আম্বেদকর দলিতদের মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জীবনের মান উন্নয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে সংবিধান তৈরিকারী গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হিসাবে দলিতদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব ব্যবস্থা দলিতদের এগিয়ে আসতে খুবই সাহায্য করে। ভারতে দলিত আন্দোলনকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায় যেমন –

(১) দূষণ রেখা অতিক্রম করার আন্দোলন (দ্য পল্যুশান লাইন ক্রসিং মুভমেন্ট) সমাজে দলিতদের উপস্থিতি অন্যদের বসবাসের ক্ষেত্রে দূষণ সৃষ্টিকারী বলে পরিগণিত হত। তারা দূষণ রেখার নীচে বসবাস করে বলে ধরা হত। তাদের মান উন্নয়নের জন্য এবং দূষণরেখা অতিক্রমের জন্য বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয় যেমন–

(ক) নাদার আন্দোলন

নাদার কথার অর্থ হল জমির মালিক। তারা তামিলনাড়ুর তপঃজাতি সম্প্রদায়। তাদের পেশা এবং আয় স্থিতিশীল নয়। তাদের বসবাসের স্থান অপরিষ্কার। এই সব কারণে তারা অস্পৃশ্য রূপে পরিচিত ছিল। এই অপমানই তাদেরকে আন্দোলনমুখী করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার তাদের সাহায্য করে। এর ফলে অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা নতুন পেশায় যুক্ত হয়। তাদের একাংশ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, এবং নতুন জীবন ধারা অনুসরণ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে।

(খ) ইজাহাভাস আন্দোলন

কেরালার অত্যাচারিত শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলন শুরু করে। শ্রী গুরুস্বামী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি এক ঈশ্বর এর ধারণায় নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। মদ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষ এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। নতুন ধর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত। পূর্বে তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। এমনকি উচ্চজাতের মানুষ তাদের ছায়া মাড়াত না। এই আন্দোলনের ফলে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি ঘটে।

(গ) জাঠাবাস আন্দোলন

আগ্রা শহরের চামার (জুতো তৈরির সঙ্গে যুক্ত) শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলন শুরু করে। শত শত বছর ধরে তারা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত ছিল। ঐ অপমানের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেছিল এবং নিজেদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পেশায়ও নিজেদের যুক্ত করেছিল।

(ঘ) সংস্কৃতায়ন আন্দোলন

দলিতরা ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত এবং ধুতি পরে এই আন্দোলন করেছিল। তারা যাতে উচ্চ জাতির সম্মান পায় সেইজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করেছিল। তারা ব্রাহ্মণদের মতো নিরামিষভোজী হয়েছিল এবং নমস্কার শব্দটি ব্যবহার করত। ব্রাহ্মণদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া এই আন্দোলন মহারাষ্ট্রের কয়েকটি ছোট এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল।

(২) ধর্মীয় আন্দোলন

তথাকথিত উচ্চজাতি দ্বারা অবমাননা ও আরোপিত সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তারা নতুন ধর্মের জন্য আন্দোলন শুরু করে। সাতনামী এই ধরনের একটি আন্দোলন। ১৮২০ দশকে জানসি দাস এই আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এমন একটি ধর্মের কথা বলেন যেখানে সব মানুষই সমান। এমনকি মিশনারীরাও এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

(৩) দ্য গ্লোরিফায়েড মুভমেন্ট

দলিতদের উপস্থিতিকে সম্মান জানানোর জন্য এই আন্দোলন। দ্রাবিড়িয়ান কাঝাঘাম পার্টি এই আন্দোলন শুরু করে। দলিতরা দ্রাবিড়দের অংশ বলে বুঝতে শুরু করে। ঐ পার্টি পরবর্তীকালে দ্রাবিড়িয়ান মুন্নেত্রা কাঝাঘাম পার্টি নামে পরিচিত হয়। এম. করুণানিধি এবং আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র তামিলনাড়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) আম্বেদকারের বহুমুখী প্রতিবাদী আন্দোলন

দলিতরা যাতে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পায় তার জন্য ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর দলিত আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এমন একটি আদর্শ সমাজ সৃষ্টির কথা ভাবতেন যেখানে জাতিভেদ প্রথা থাকবে না। তাঁর অনেক অনুগামী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা এখন নব বৌদ্ধ নামে পরিচিত। ডঃ বি. আর.

আম্বেদকর তাদের দলিতদের জন্য লোকসভা, বিধানসভা এবং সরকারি চাকুরিতে আসন সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পুরোহিততন্ত্রের বিরোধিতা করতেন। বস্তুতপক্ষে, ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের প্রচেষ্টার ফলে – স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দলিতদের সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়। ঐ সকল আন্দোলন অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে – তার কারণ তিনি সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও শিক্ষাকে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রণী দলিতদের সাহায্যে নতুন রূপে দলিত আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু সঠিকভাবে সংগঠিত না হওয়ার এবং সরকারি সহযোগিতা না থাকায় ঐ সকল আন্দোলন সফল হতে পারে নি।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে অন্ধ-প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং মিজোরামে সংগঠিত দলিত আন্দোলন ভিন্ন ধরনের। ঐ সব আন্দোলন কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও দলিতরা এখনও শোষিত। অস্পৃশ্যতা এখনো বিদ্যমান। স্বাধীনতার পরেও একই ধারা দেখা যাচ্ছে। এই কারণে অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এখনো দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং বর্তমানে এই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, দলিত আন্দোলন সমাপ্ত করতে হলে দলিতদের জন্য শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে এবং অন্যদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াস এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে।

৬.৩ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ। ১৯৯২ সাল থেকে পৃথকভাবে এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে–

- ন্যাশন্যাল্ কমিশন্ ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস গঠন।
- প্রাক-মাধ্যমিক্ ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরে বৃত্তি প্রদান।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণে বে-সরকারি সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা।
- ন্যাশন্যাল্ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফিন্যান্স্ এন্ড্ ডেভেল্যাপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন ইত্যাদি।

৬.৪ মন্তব্য / মতামত

৬.৪.১ তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির পরিবর্তন

বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সরকারি প্রচেষ্টার ফলে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল –

(১) তপঃ শিলি উপজাতি, তপঃশিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে। এমন কি মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার ও ভেটারিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সকল শ্রেণির ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) সরকারি ও বে-সরকারি জায়গায় গত কয়েক বছরে তাদের নিযুক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) ইন্দিরা আবাস যোজনায় অনেকের গৃহ নির্মাণ হয়েছে।

(৫) ভূমি সংস্কারের জন্য অনেক রাজ্যে ভূমিহীনরা জমির মালিক হয়েছে।

(৬) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুখা মরসুমে তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পাচ্ছে এবং হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

(৮) আদিবাসীরা ক্ষুদ্র বনজ দ্রব্যের মালিকানা পেয়েছে।

(৯) আদিবাসীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

(১০) আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

(১১) ন্যাশন্যাল কমিশন ফর এস.সি এন্ড এস.টি এবং পার্ল্যাম্যান্টারী কমিটি গঠনের ফলে তপঃউপজাতি ও তপঃজাতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প রূপায়ণ ত্বরান্বিত হয়েছে।

(১২) লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েতে তাদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পদমর্যাদা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে তপঃউপজাতি, তপঃজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও বহুমুখী সমস্যার গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। উন্নয়নের কাজে ব্রতী সমস্ত সংস্থাকে আরো গভীরভাবে বিষয়টি ভাবতে হবে। বে-সরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তাদের কাজকর্ম আরো সুনির্দিষ্ট হতে হবে। আর সমস্ত ক্ষেত্রে উপভোক্তা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪.২ বে-সরকারি সংস্থা ও সমাজকর্মীদের ভূমিকা

বর্তমানে বে-সরকারি সংস্থা উন্নয়নের অন্যতম কারিগর হিসাবে কাজ করছে। আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে

তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করছে। বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ অনেক বে-সরকারি সংস্থা আছে। তারা নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে–

(১) যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা কাজ করা দরকার তা অনুধাবন করা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

(২) উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বে-সরকারি সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

(৩) যদিও সরকারি দপ্তর ও পঞ্চায়েত আদিবাসী উন্নয়নে কাজ করছে তবু অনেক ঘাটতি চোখে পড়ে। বে-সরকারি সংস্থা ঐ ঘাটতি পূরণের কাজ করতে পারে।

(৪) বে-সরকারি সংস্থাগুলি স্থানীয় এলাকার বা তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে যাতে তারা তাদের এলাকা এবং জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৫) মানুষ নিজেদের সমস্যার বিরুদ্ধে যাতে লড়াই করতে পারে তার জন্য বে-সরকারি সংস্থা তাদের পরামর্শ দান করতে পারে।

পেশাগত সমাজকর্মীদেরও আদিবাসী সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জীবন ও জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে আদিবাসীদের উন্নয়নের কাজে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে তা হতে পারে–

(১) জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন বিষয়ে আদিবাসীদের সচেতন করতে পারে।

(২) আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও তদের উন্নয়নের সরকারি নীতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান ও আলোচনা করতে পারে।

(৩) সমাজকর্মীরা আদিবাসীদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করতে পারে যাতে আদিবাসীরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

(৪) সাক্ষরতা, সাক্ষরোত্তর, প্রবহমান শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ছুটদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

(৫) আদিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে যাতে তারা চিরচরিত ঝুম বা স্থানান্তরিত প্রথায় চাষ ছেড়ে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হতে পারে। এইভাবে তাদের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

(৬) আদিবাসী নেতাদের শনাক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের কাজে লাগাতে হবে।

(৭) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।

(৮) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার।

(৯) স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(১০) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের সঠিক যত্নের জন্য টীকাকরণ সহ ঐ ধরনের সমস্ত পরিষেবা যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে তা দেখতে হবে।

(১১) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে তাদের যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(১২) তাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদ চিহ্নিত করার জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন।

(১৩) যুবকরা যাতে তাদের এলাকায় সংগঠন গড়ে উন্নয়নের কাজ করতে পারে তার জন্য আদিবাসী যুবকদের সাহায্য করা দরকার।

(১৪) উন্নয়নমুখী হওয়া এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আদিবাসীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

(১৫) অন্যান্য শ্রেণির মানুষের শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) ইন্ডিয়ান সোস্যাল্ প্রবলেম্ (দ্বিতীয় খন্ড) - জি. আর. মদন।

(২) এ রেসপন্সিব্ল গভর্ণমেন্ট্ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

(৩) ইন্ডিয়া ২০০৬ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।

৬.৬ অনুশীলনী

(১) আদিবাসী বলতে কি বোঝায়? তারা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করুন।

(২) আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

(৩) ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৪) তপঃশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক ঃ ৭ শ্রম কল্যাণ

গঠন

৭.১ আদিবাসী কল্যাণ

৭.২ শ্রম কল্যাণের ধারণা

৭.৩ শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব

৭.৪ জীবন ধারণের মান, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং শ্রমিকের দক্ষতা

৭.৫ ভারতের শ্রম আইন

৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা

৭.৭ ট্রেড ইউনিয়ন

৭.৮ শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি

৭.৯ শিশু ও মহিলা শ্রমিক

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১১ অনুশীলনী

৭.১ শ্রম ও শ্রমিকের ধারণা

অর্থের বিনিময়ে যে কোন কাজই হল – শ্রম। 'শ্রম' কথাটি জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং শ্রমিক কথাটি থেকে একে আলাদা করা যায় না। শ্রম সর্বদা নশ্বর একে সংরক্ষণ করা যায় না। অন্যদিকে শ্রমিক হল মানুষ এবং তার সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্ত্বা রয়েছে। সুতরাং শ্রম হল – যে কাজ করা হল, আর শ্রমিক হল – যে ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে কাজটি করল। শ্রমিক হল কর্মী। শ্রম হল তার শরীর ও মনের সমন্বয় সাধনে কৃতকর্ম। যদিও সাধারণত শ্রম শব্দটি কর্ম ও কর্মী উভয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭.২ শ্রম কল্যাণের ধারণা

শ্রম কল্যাণ কথাটির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণে যে কোন ধরনের কর্মসূচি বা কাজকর্মকে বোঝানো হয়। যদিও শ্রম কল্যাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম তবু মৌলিক বিষয়গুলি একই রকম। শ্রম কল্যাণের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং অন্যান্য সাধারণ সুযোগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে শ্রম কল্যাণ হল – শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা। সোস্যাল্ সায়েন্স এনসাইক্লোপেডিয়া

অনুসারে শ্রম কল্যাণ হল – শিল্পক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র সাংস্কৃতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রতি নিয়োগকারীর সুযোগ সুবিধা প্রদানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, যা – আইন, শিল্প ক্ষেত্রের রীতি এবং বাজার পরিস্থিতির উর্ধ্বে। দ্যা রয়্যাল কমিশন্ অন্ লেবার ইন্ ইন্ডিয়া (১৯৩১) মতে – শিল্প শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ শব্দটি এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যা পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনশীল, যদিও বিভিন্ন দেশে প্রথা, শিল্পায়নের পরিস্থিতি, কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ করা হয় থাকে।

আর্থার জেমস্ টোড এর মতে – পারিশ্রমিক বাদে, শ্রমিকদের মানসিক ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে যা কিছু করা হয়, যদিও শিল্পে এর প্রয়োজন নেই – তাই শ্রম কল্যাণ।

ই.এস.প্রাউড বলেছেন – শিল্পের উন্নতির স্বার্থে এবং নিজেদের শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সুযোগ সুবিধার জন্য নিয়োগকারীর স্বেচ্ছায় করা কিছু কল্যাণমূলক কর্ম।

যদি উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে কোন সংজ্ঞাই সুসংহত বা ব্যাপক নয়। কিন্তু সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিষ্কার যে বিষয়টি সেটি হল – শ্রমিকের কল্যাণে কিছু কর্মসূচি বা প্রয়াস। এই প্রচেষ্টা তাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বসবাস, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত। এটি শ্রমিক শ্রেণির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত। ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ক্যান্টিন, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাথরুম, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াতের সংক্রান্ত পরিষেবার কথা বলা হয়েছে।

৭.৩ শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব

শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব দু-টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রধানত শ্রমিকের পরিমাণগত ও গুণগত শ্রমের উপর নির্ভরশীল। যদি তারা উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে, প্রফুল্ল থাকে এবং সৃজনশীল হয় তবে উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বাড়বে। অন্যদিকে তারা যদি দারিদ্র্য ও হতাশায় ভুগে, সুস্থাস্থ্যের অধিকারী না হয়, অদক্ষ হয়, কাজের পরিবেশ যদি ঠিক না থাকে বা মৌলিক পরিষেবা না থাকে তবে উৎপাদন ও গুণগত মান কমবে। তাই , রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে স্বভাবতই কল্যাণমূলক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণির সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় – তারা বিভিন্ন সমস্যার শিকার যেমন – শোষণ, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনুপযুক্ত বসবাসের অবস্থা, দারিদ্র্য, সুস্বাস্থ্যের অভাব, কু-সংস্কার ইত্যাদি। অধ্যাপক আর. সি. সাক্সেনা সঠিকভাবেই বলেছেন – ভারতীয় শ্রমিকরা শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্তিকে বোঝা বা অভিশাপ রূপে দেখে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেখান থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই তাদের জীবনের ও কর্মস্থলের অবস্থার উন্নতি না ঘটালে একটি সন্তুষ্ট, স্থায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকশ্রেণি গঠন সম্ভব নয়। তাই পশ্চিমি দেশ যেখানে শ্রমিকের অবস্থা এতখানি খারাপ নয় সেই সব দেশের তুলনায় ভারতে শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৭.৪ জীবন ধারণের মান, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং শ্রমিকের দক্ষতা

ভারতীয় শ্রমিকদের জীবন ধারণের মান খুবই অনুন্নত। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ শিল্প শ্রমিক বস্তি এলাকায় বসবাস করে। গ্রামের কৃষি শ্রমিক মাটির কুঁড়ে ঘরে বাস করে। সাধারণত একটি ঘর থাকে এবং সেই ঘরটি রান্নাবান্না, ঘুমানো, ওঠাবসা সব কাজেই ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে জানালা থাকে না। উচ্চতাও খুব কম। মেঝে নীচু, কাঁচা তাই, প্রায়ই আর্দ্র থাকে। দু-টি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না কিংবা স্বল্প দূরত্ব থাকে। আলো, জল নিকাশী, নোংরা ফেলার জায়গা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে না। দ্যা রয়্যাল কমিশন্ অন্ লেবার সঠিকভাবে বলেছেন যে – এরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষ জন্মায়, ঘুমায়, খাদ্য গ্রহণ করে এবং জীবন ধারণ ও মৃত্যু বরণ করে। ফলস্বরূপ তাদের জীবন ধারণের মান অনুন্নত। তাদের চিরন্তন দারিদ্রতা জীবনের মানকে এতখানি প্রভাবিত করে যে – তারা কেবল বেঁচে থাকে মাত্র, সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না। তাদের দারিদ্র্যের কারণগুলি হল – কম পারিশ্রমিক, উচ্চ জন্মহার, মাদকাশক্তি এবং অ-স্বাস্থ্য। বসবাসের পরিবেশ এগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, অধিক সন্তান, অধিক শিশুমৃত্যু, নারীর নিম্ন সামাজিক পদ-মর্যাদা ইত্যাদি শ্রমিক শ্রেণির জীবনের অঙ্গ। কিছু কিছু শিল্প যেমন – চা-কফি বাগানের শ্রমিকদের পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ।

কর্মস্থলের পরিবেশও অধিকাংশক্ষেত্রে খারাপ। দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তাও যথেষ্ট নয়। মেসিন সঠিক অবস্থায় থাকে না, মেসিনের চারদিকে বেড়া রাখা হয় না, আলো ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকে না, মেঝে হয়তো বা অসমতল ও আর্দ্র, ধোঁয়া এবং ধুলো ভিতরে জমা হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল থাকে না, থুতু ফেলার জায়গা, শৌচাগার থাকে না বা থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। অনেক শিল্প, কল-কারখানায় ভোজনালয় ও বিশ্রামাগার থাকে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারখানার ছাউনির উচ্চতা কম, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা সঠিক থাকে না। নিয়মিত বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে পোশাকের নিয়ম থাকে না। কর্মস্থল জনবহুল। কাজ করতে করতে শেখা ছাড়া কর্মীদের জন্য অন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না।

যদিও শ্রমিক-কর্মীদের কল্যাণে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবু, ভারতের শিল্প, কলকারখানাগুলিতে নিয়মানুগ ব্যবস্থা নেই। দ্যা লেবার ইনভেস্টিগেশন্ কমিটি বিভিন্ন শিল্প পরিদর্শন করে বলেছে – বড় বড় শিল্প, কল-কারখানায় কাজের পরিবেশ উপযুক্ত রয়েছে কিন্তু ছোট, অনিয়ন্ত্রিত কল-কারখানায় বিশেষ করে যে সব শিল্প পুরাতন বাড়ির মধ্যে অবস্থিত সেখানে আলো, বাতাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উন্নতির প্রয়োজন।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা প্রশ্নাতীত নয়। কঠোর পরিশ্রম, অনুপযুক্ত কাজের পরিবেশ, কম পারিশ্রমিক, মাদকাশক্তি ইত্যাদি কারণে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজন অপুষ্টির শিকার। অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতির হার বেশি। পরিস্থিতি বিচার করে ভারত সরকার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্ল্যানিং কমিশনও স্বাস্থ্য পরিষেবা বর্ধিত করা এবং দক্ষতা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছেন।

৭.৫ ভারতের শ্রম আইন

শ্রমজীবী মানুষদের কল্যাণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন অনুমোদন করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি আলোচনা করা হল–

(ক) দ্যা ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনশেসন অ্যাক্ট, ১৯২৩

শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই কেন্দ্রীয় আইন ১৯২৩ সালে অনুমোদন করা হয়। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আইনটি কার্যকরী হয়। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে কর্মীরা ক্ষতিপুরণ পাবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দুর্ঘটনার ধরন ও প্রভাবের উপর নির্ভর করবে। আইন অনুসারে রাজ্য সরকার একজন কমিশনার নিয়োগ করবে। কমিশনারের কাজ হবে দুর্ঘটনার ধরন অনুসারে ক্ষতিপূরণ ঠিক করা। শিল্প কারখানার নিরাপত্তা যেমন মেসিনের ঘেরাটোপ, নিরপত্তা সংক্রান্ত পোস্টার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পাঁচটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যবস্থা কেমন কমিশনারের কার্যালয় থেকে তা তদারকি করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হতে পারে, অঙ্গহানি হতে পারে বা ক্ষণস্থায়ী সমস্যা হতে পারে। মৃত্যু হলে, নিয়োগকারী কমিশনারের কাছে ক্ষতিপূরণ জমা দেবে এবং কমিশনার তা মৃত কর্মীর উপযুক্ত নমিনিকে দেবে। নিয়োগকারী মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ জমা না দিলে সুদ সহ জরুরি ভিত্তিতে তা জমা দেওয়ার জন্য কমিশনার নির্দেশ দেবেন। স্থায়ীভাবে অঙ্গহানির ক্ষেত্রে কর্মী যাতে নিয়মিত ক্ষতিপূরণ পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য কমিশনারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সাময়িক বা আংশিক সমস্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় উভয়পক্ষ ও কমিশনারের সহমতে।

(খ) দ্যা এম্প্লয়িজ স্টেট ইনসিয়োরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৮

এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মীকে অসুস্থ বা মাতৃত্বকালীন অবস্থায় সহায়তা করা। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আইন পরিবর্তিত হয়েছে। যে সব কল-কারখানা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না এবং ২০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন কারখানার ক্ষেত্রে এই আইনটি প্রযোজ্য। যদিও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না এবং ২০ জনের কম কর্মী আছে এমন কারখানার ক্ষেত্রেও ক্রমশ আইনটির প্রয়োগ ঘটছে। দোকান, হোটেল, রেস্তঁরা, থিয়েটার পত্রিকা দপ্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আইনের প্রয়োগ হচ্ছে।

স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী, কারিগরি বা অন্যান্য সকল কর্মী এই আইনের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। একটি কর্পোরেট গোষ্ঠী আইনটির প্রায়োগিক দিকগুলি দেখে। শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ঐ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হবেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী ভাইস্ চেয়ারম্যান্ হবেন। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও নিয়োগকারী, কর্মী এবং চিকিৎসক ঐ গোষ্ঠীর সদস্য।

দেশের সর্বত্র স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে এই গোষ্ঠীর কার্যালয় রয়েছে। আঞ্চলিক ডাইরেক্টরের অধীনে আঞ্চলিক কার্যালয়ে কাজকর্ম হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা মূলত ই.এস.আই. হাসপাতালের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অন্যান্য কিছু হাসপাতালেও শয্যা সংরক্ষিত থাকে। বহির্বিভাগীয় পরিষেবাও দেওয়া হয়। তাছাড়া বেশ কিছু চিকিৎসক ই.এস.আই. হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী ও তাদের পরিবারের চিকিৎসার কাজে যুক্ত থাকে।

(গ) দ্যা এম্প্লয়িজ প্রোভিডেন্ট ফান্ডস এন্ড মিসেলেনিয়াস প্রোভিসনস্ অ্যাক্ট, ১৯৫২

এই আইনের মাধ্যম অবসরের পর কর্মীকে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ২০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন শিল্প ও অন্যান্য সংস্থার কর্মীরা ৩ বছর কাজ করলে এই সুযোগ পাবেন। সংস্থা কর্মীদের পৃথক পি.এফ. একাউন্ট রাখবে এবং বছরের শুরুতে গত বছরের আর্থিক পরিস্থিতি বিশদভাবে কর্মীকে জানাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রস্তাব অনুসারে সুদের হার স্থির করবে। অবসরকালে কর্মী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পি.এফ. এর টাকা পাবেন। মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত আত্মীয় যেমন ছেলে বা ভাইপো ওই টাকা পাবে। সারা দেশে পি.এফ. কার্যালয় রয়েছে। পি.এফ. সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা ছয় সপ্তাহের মধ্যে কমিশনারের গোচরে আনা যেতে পারে।

(ঘ) দ্যা পেমেন্ট অব্ গ্র্যাটুইটি অ্যাক্ট, ১৯৭২

এই আইনের মাধ্যমে অবসরের পরে আর একটি সুবিধা দেওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্মী কাজ করলে এই সুযোগ পাবেন। পূর্বে নিয়োগকারী স্বেচ্ছায় এই সুযোগ দিত। বর্তমানে এটি বাধ্যতামূলক। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ হবে কর্মী যত বছর কাজ করেছে তত মাসের অর্ধেক বেতন।

এই আইন, শিল্প, কলকারখানা, খনি, বন্দর, রেল বিভাগ এবং দশ কিংবা তার বেশি কর্মী কাজ করে এমন দোকান ও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মীর অবসরের তিন মাসের মধ্যে গ্রাচুইটির টাকা দিতে হবে। পি.এফ. এর নিয়মের মতোই কর্মীর মৃত্যু হলে স্ত্রী কিংবা উপযুক্ত প্রতিনিধি এই টাকা পাবে। গ্রাচুইটি দাবী করার সাধারণ নিয়ম হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগকারীর কাছে আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়োগকারী সঠিক পরিমাণ টাকা না দিলে নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে কন্ট্রোলিং অথরিটির কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। কন্ট্রোলিং অথরিটি কালেক্টরের মাধ্যমে ওই অর্থ সংগ্রহ করবে এবং আবেদনকারীকে দেবে।

(ঙ) দ্যা ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, ১৯৬১

মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে

- গর্ভবতী মহিলা প্রসবের পূর্বে এবং পরে তিনমাস ছুটি পাবেন। বর্তমানে চার মাস ছুটি দেওয়া হয়।
- সময় নিয়োগকারীর কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধাও পাবে।
- গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ছয় মাসের ছুটি পাবে।
- প্রসব কিংবা গর্ভপাত উভয় ক্ষেত্রে কর্মীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ আবেদন করতে হবে।
- গর্ভাবস্থা, প্রসব বা গর্ভপাতের ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে আরো চার সপ্তাহ ছুটি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।
- ছুটির পরে কাজে যোগদান করলে তাঁকে একমাস হালকা কাজ দিতে হবে।
- সাধারণ বিশ্রাম ছাড়াও তাঁকে দু-বার বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে যতদিন না শিশুর এক বছর তিন মাস বয়স হয়।

● এই ধরনের বিশ্রামের সময়সীমা রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুসারে ঠিক করা হয়।

● কর্মী এই আইনের সুযোগ তখনি পাবে যদি সে সম্ভাব্য প্রসবের তারিখের পরে বারো মাসের মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে ৮০ দিন কাজ করে থাকে।

● যদি মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগের সময় কর্মী অন্য কোন সংস্থায় কাজ করে কিংবা কোন খারাপ কাজের জন্য বহিষ্কৃত হলে মাতৃত্বকালীন সহায়তা পাবে না।

(চ) দ্যা মিনিমাম ওয়েজস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৮

শান্তি, সম্মান ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই আইন। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে মানুষের দাবী করার ক্ষমতা কম যেখানে এই আইন অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৩ সাল থেকে স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটিতে এই সংক্রান্ত আলোচনা হত এবং ১৯৪৮ সালে গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের পর আইনটি গৃহীত হয়। জম্মু কাশ্মীর ছাড়া দেশের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য। এই আইননের সহায়তায় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা হয়। এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা রয়েছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা–

● শাল, উলের বস্ত্র তৈরি,

● ডাল, তেল, চাল, মিল, আটা-ময়দা মিল,

● বিড়ি তৈরি,

● নির্মাণ কাজ, সারনো, পাথর কাটা,

● লাক্ষা উৎপাদন, প্রোসেসিং,

● চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

কৃষি কাজ, ডেয়ারি, পোল্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মীরাও এই আইনের সুবিধা পাবে।

এই আইনের ভিত্তিতে সরকার কাজের স্বাভাবিক সময়সীমা এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঠিক করবেন। যদি কেউ কম মজুরি দেয় তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আইন ১৯৫৭ সালে সংশোধিত হয়। সরকার কিছু নীতি তৈরি করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল – মজুরি এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে কর্মীরা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দিক থেকে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। ১৯৫৭ সালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেনসে নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার কথা বলা হয় –

১। খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা নির্ধারণ,

২। মজুরির ২০ শতাংশ জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচ। অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি হবে জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খরচের পাঁচ গুণ।

(ছ) দ্যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট, ১৯৪৭

ভারতবর্ষে প্রায়ই শিল্প বিরোধ দেখা যায়। এই ধরনের বিরোধ সমাধানের জন্য ১৯৪৭ সালে আইনটি গৃহীত হয়। ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। ১৯২৯ সালের ট্রেড

ডিসপিউট আইনের পরিবর্তে এই আইন গৃহীত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল শিল্পক্ষেত্রে বিরোধ প্রতিরোধ এবং সমাধান করা। এই আইনের অধীনে বিভিন্ন আধিকারিক রয়েছে যেমন –

ওয়ার্কস্ কমিটি

যে সব শিল্পে ১০০ বা বেশি কর্মী রয়েছে সেখানে নিয়োগকারী ও কর্মীদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির কাজ হবে কর্মী ও নিয়োগকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কমিটি বিরোধের কারণগুলি কমিয়ে আনার চেষ্টা করে।

কনসিলেশন অফিসার

সরকার কনসিলেশন অফিসার নিয়োগ করবেন যার কাজ হবে শিল্প বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতা করা। এরূপ অফিসার নির্দিষ্ট জায়গায় বা শিল্পে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

বোর্ড অব কনসিলেশন

পরিস্থিতির জটিলতা অনুসারে সরকার এই বোর্ড গঠন করতে পারে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর চেয়ারম্যান হবে এবং কর্মী ও নিয়োগকারীর মধ্য থেকে দুই চার জন প্রতিনিধি থাকবে। বোর্ড সরকারকে অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত করবে। কোরাম হলে বোর্ড মিটিং হবে। সেখানে চেয়ারম্যান নাও থাকতে পারে।

কোর্ট অব এনকোয়ারী

যদি শিল্প বিরোধ কনসিলেশন অফিসার বা বোর্ড অব কনসিলেশনের মাধ্যমে সমাধান না করা যায় তবে বিষয়টি কোর্ট অব এনকোয়ারিতে পাঠাতে হয়। বিশদ অনুসন্ধানের পর কোর্ট সরকারকে রিপোর্ট দেবে যা পরবর্তীকালে ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল ফর এডজুডিকেশনে পাঠানো হয়।

লেবার কোর্ট

এই আইন অনুসারে সরকার শিল্প বিরোধ সমাধানের জন্য লেবার কোর্ট গঠন করতে পারে। লেবার কোর্ট শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দেবে।

ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রাইবুন্যাল

সরকার শিল্প বিরোধ সমাধানের জন্য এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করবে এবং সরকার কেবল একজন ব্যক্তি নিয়োগ করবে। ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারপতির সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে। জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ সমাধানের জন্য জাতীয় স্তরে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা যেতে পারে।

(জ) দ্যা ফ্যাক্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৪৮

১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকরী হয়। এর উদ্দেশ্য হল, সমস্ত ধরনের শিল্পে কাজের পরিবেশ উন্নত করা। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রয়েছে–

(ক) **পরিচ্ছন্নতা ঃ** কর্মীদের যাতে স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য সমস্ত কারখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অপরিচ্ছন্ন নর্দমা বা নর্দমা গর্ত বাসস্থানে যেন না থাকে।

(খ) **আবর্জনা ও উদগত পদার্থ অপসারণ ব্যবস্থা ঃ** আইন অনুসারে সব ধরনের শিল্প কারখানাকে আবর্জনা ও উদ্গত পদার্থ অপসারণ করতে বাধ্য করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(গ) **কৃত্রিম আর্দ্রতা ঃ** এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে আর্দ্রতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি করা। এবং এর জন্য ব্যবহৃত জল যেন পরিশুদ্ধ হয় তা দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) তাপমাত্রা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ঃ সমস্ত কল কারখানায় যাতে উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে এবং তাপমাত্রা যেন স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণ না হয় এবং কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে তা দেখার দায়িত্ব সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) জনবহুল অবস্থা ঃ আইন অনুসারে কোন কর্ম পরিবেশ এমন জনবহুল হবে না যাতে কর্মীদের কাজের অসুবিধা হয়। আইন অনুমোদনের পূর্বে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেখানে প্রতি কর্মীর জন্য অন্তত ৩৫০ কিউবিক ফুট জায়গা থাকে। আইন গৃহীত হওয়ার পরে যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রতি কর্মীপিছু ৫০০ কিউবিক ফুট জায়গা রাখতে হবে।

(চ) ধুলো ও ধোঁয়া ঃ কারখানা থেকে ধুলো ও ধোঁয়া নির্গত হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিপর। এই আইনের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সেগুলি না জমা হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কর্মীর শরীরে না প্রবেশ করে।

(ছ) পানীয় জল ঃ আইন অনুসারে রাজ্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা থাকে তা সুনিশ্চিত করা। জলের কল এমন জায়গায় থাকবে যেখানে অতি সহজে কর্মীরা তা ব্যবহার করতে পারে। রাজ্য সরকার জলের ব্যবস্থা এবং জলের গুণগত মান খতিয়ে দেখবে।

(জ) বাথরুম ঃ প্রতিটি কল কারখানায় মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় পৃথক পৃথক বাথরুম থাকবে। সেগুলি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যাতে কর্মীরা কর্মরত অবস্থায় সহজে ব্যবহার করতে পারে। সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সব শিল্প কারখানায় যাতে সঠিক ভাবে এই আইন রূপায়িত হয় তা সরকার দেখবে।

(ঝ) আলোর ব্যবস্থা ঃ রাজ্য সরকার এই আইন অনুসারে বাথরুম, ক্যানটিন, গেট, রাস্তা ইত্যাদি স্থানে উপযুক্ত আলো সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি করবে যাতে দুর্ঘটনা ও কর্মীর চোখের অসুবিধা না হয়।

(ঞ) থুথু ফেলার জায়গা ঃ আইন অনুসারে উপযুক্ত স্থানে থুতু ফেলার জায়গা রাখতে হবে। সেগুলি সঠিকভাবে রাখতে হবে যাতে নোংরা না হয়।

৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে – সদস্যরা সমস্যার সম্মুখীন হলে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে কিছু প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানকে বোঝায়। স্যার ইউলিয়ম বেভারেজের মতে, সামাজিক নিরাপত্তা চাহিদা, রোগ, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা এবং অসুস্থতা এই পাঁচটি বিষয় সংক্রান্ত প্রচেষ্টা। আই.এ.ও মতে, সদস্যরা সমস্যার সম্মুখীন হলে উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ যে পরিষেবা প্রদান করে তাই সামাজিক নিরাপত্তা। অসুস্থতা, মাতৃত্ব, অক্ষমতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই বিষয়গুলি দেখা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কথটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়

– যার মধ্যে রয়েছে বীমা প্রকল্প এবং সামাজিক সহায়তা। তবে, এর অর্থ এবং পরিধি প্রথা ও আইন অনুসারে দেশে দেশে কিছুটা হলেও ভিন্ন।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিষেবার মধ্যে রয়েছে বীমা, সামাজিক ও জনহিতকর পরিষেবা। বিষয়গুলি শ্রম কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সারা বিশ্বে শ্রমিকদের জীবন যাপন ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে আই.এল.ও. স্থাপিত হয় এবং এই সংস্থার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়–

(ক) সামাজিক নিরাপত্তা কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ – যা আন্তর্জাতিক মানের হবে।

(খ) বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প একত্রিত করা এবং বিনিময় করা।

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প তৈরির জন্য কারিগরী জ্ঞান এবং সহায়তা প্রদান।

১৯৫২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আই.এল.ও সম্মেলনে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে ৯টি উপাদানে ভাগ করা হয় যেমন – চিকিৎসা পরিষেবা, অসুস্থতার সময় সহায়তা, বেকারদের সহায়তা, বার্ধক্যকালে সহায়তা, পারিবারিক সহায়তা, মাতৃত্ব জনিত সহায়তা, কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে সহায়তা, ব্যক্তিগত এবং জীবিতদের জন্য সহায়তা ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

(ক) এগুলি বাধ্যতামূলক হবে,

(খ) এগুলি অধিকার বলে ধরা হবে,

(গ) প্রাসঙ্গিক আইনানুগ পরিস্থিতি অনুসারে সহায়তা প্রদান করা হবে,

(ঘ) সহায়তা কর্মীর প্রদেয় অংশের তুলনায় বেশি হবে,

(ঙ) কর্মীর প্রয়োজন ও আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবারই ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ধর্মীয় সংগঠন, ধনী পরিবার, যোলআনার বিষয়, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিরও ভূমিকা রয়েছে। অতীতের সামাজিক নিরাপত্তা ছিল অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলি এই ভূমিকা পালন করত। পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ সমস্ত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র অধিকাংশ দায়িত্ব গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ করে, শ্রমিক শ্রেণির জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন – ফ্যাকট্রি অ্যাক্ট, ওয়ার্ক ম্যানস্ কমপেনশেসন অ্যাক্ট, ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট, স্টেট ইনসিওরেন্স অ্যাক্ট, কোল মাইনস্ প্রোভিডেন্ট ফান্ড্ এন্ড বোনাস স্কিমস্ অ্যাক্ট, প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট, ম্যাটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট, সিমেনস প্রোভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট, এম্প্লোইজ ফ্যামিলি পেনশন স্কিম এবং গ্রাচুইটি অ্যাক্ট ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় – এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, অ্যাক্টগুলি সমস্ত শিল্পে সঠিকভাবে যেন রূপায়ণ করা হয় তা দেখতে

হবে। গত শতকের শেষের দিকে বিষয়টি আশাপ্রদভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু শুরু করাটাই শেষ কথা নয়। বর্তমান পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে সমস্ত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের লোকজন সুবিধা পেতে পারে। কোন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নয়, ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের পরিবারের সামগ্রিক উন্নতি হয়।

৭.৭ ট্রেড ইউনিয়ন

সিডনি এবং ওয়েব এর মতে ট্রেড ইউনিয়ন হল – শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে গঠিত শ্রমিকদের সংগঠন। এ মঞ্চ তৈরি করে শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুতরাং, এই ইউনিয়ন গঠনের মূল কারণ হল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রের অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা। ট্রেড ইউনিয়ন হল শ্রমিকদের মঞ্চ। তারাই গঠন করে, দেশের আইন অনুসারে রেজিস্ট্রেইশন্ করে, অর্থ সংগ্রহ করে, নেতা নির্বাচন করে, কার্যালয় স্থাপন করে, শাখা অফিস স্থাপন করে এবং নিজেদের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের কাজকর্ম সাধারণত তিন ধরনের।

(ক) চত্বরের মধ্যে কাজকর্ম

এই ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, ভালো কাজের পরিবেশ, কাজের সময়সীমা, নিয়োগকারীর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার, লভ্যাংশের অংশ ইত্যাদি সংক্রান্ত। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেমন – দর কষাকষি, মধ্যস্থতা, ধর্মঘট ইত্যাদি। এরূপ কাজকর্ম আক্রমণাত্মক কাজ বলে পরিচিত।

(খ) চত্বরের বাহিরে কাজকর্ম

এরূপ কাজকর্ম হল কর্মীদের প্রয়োজনে তাকে সাহায্যে করা। ইউনিয়ন তাদের বহুমখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সহযোগিতার মনোভাব, শিক্ষা, সুন্দর সম্পর্ক, এবং কর্মীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে। ইউনিয়ন চিকিৎসা ও দুর্ঘটনা জনিত সুযোগ সুবিধা এবং ধর্মঘট বা লক আউটের সময় প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে। প্রয়োজন হলে তারা আইনি সহায়তাও দেয়। ইউনিয়ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক কর্মসূচি, গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরিচালনা করে। কিছু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিও গ্রহণ করে। এইসব কর্মসূচি সহোদর বা ভ্রাতৃত্বমূলক।

(গ) রাজনৈতিক কাজকর্ম

বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের কেউ কেউ পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এইভাবে তারা সরকারের শ্রম নীতিকে প্রভাবিত করেন।

ভারতের প্রধান প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল – আই.এন.টি.ইউ.সি., এ.আই.টি.ইউ.সি., এইচ.এম.এস., ইউ.টি.ইউ.সি., বি.এম.এস., ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (লেনিন সরনি), সি.আই.টি.ইউ., এন.এফ.আই.টি.ইউ. ইত্যাদি।

৭.৮ শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি

কল্যাণ কথাটির অর্থ মানুষ ও জনগোষ্ঠীর মঙ্গলসাধন। এই ধারণা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি আলাদা তাই কল্যাণ কর্মসূচিও কিছুটা ভিন্ন। তবে বলা যায় আর্থ-সামাজিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের জীবনধারার উন্নতি ঘটানোর প্রয়াসই হল কল্যাণ। শ্রম কল্যাণ কথাটি ৭.২ অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু কিছু শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি সংবিধান স্বীকৃত। ওই সকল কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিষয়গুলি কর্ম-পরিবেশ সংক্রান্ত যেমন—কাজের সময়, উপযুক্ত আলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৌচালয় ইত্যাদি। কিছু কিছু কাজ স্বেচ্ছায় করা হয়। সেগুলি করতে সাধারণত কোন সামাজিক সংগঠন যেমন – ওয়াই.এম.সি.এ., ওয়াই.ডব্লিউ.সি.এ., লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি সাহায্য করে। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু কল্যাণ করা হয়।

শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণ দু-ভাবে হয়। অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয়। অন্তর্বিভাগীয় পরিষেবা ফ্যাক্টরির চত্বরে যেমন – বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাথরুম, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভোজনালয়, উপযুক্ত আলো, নিরাপত্তা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, যন্ত্র ও কারখানার সঠিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। বহির্বিভাগীয় পরিষেবা বা ফ্যাক্টরির চত্বরের বাইরে দেওয়া হয় যেমন – বসবাস, ক্লিনিক ও অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবা, বিনোদন, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং খেলাধূলা ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রম কল্যাণ কিছুটা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক। এই প্রচেষ্টা শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকজনদের সুন্দরভাবে সামাজিক জীবনযাপনে সহায়ক।

৭.৯ শিশু ও মহিলা শ্রমিক

আমাদের দেশে শিশু ও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিশেষ করে শিল্প, চাল তৈরি এবং কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে দোকান, কার্পেট শিল্প, বিড়ি শিল্প, চুড়ি শিল্প, মাইকা শিল্প, চর্ম শিল্প, ইঁট ভাটা এবং বাড়ির কাজে শিশু শ্রমিক বেশি। ১৫ বছরের নীচে যে কোন ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে কাজ করলে তাকে 'শিশু শ্রমিক' বলা হয়। লেবার ইনভেস্টিগেশন্ কমিটি এক সময় দেখেছিল – ডুয়ার্স অঞ্চলে ২৫.৭ শতাংশ, দার্জিলিং এ ২১ শতাংশ এবং আসাম উপত্যকায় ১৪.৫ শতাংশ শিশু শ্রমিক কাজ করে। ব্যক্তিগত কারখানায়ও শিশু শ্রমিকরা কাজ করে। এবং তামিলনাড়ুতে এটা খুব বেশি। কল-কারখানায় কাজ করা শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ছেলেরাই বেশি।

সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশু শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কম। এবং তা প্রাপ্তবয়স্কদের মজুরীর প্রায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাজের সময়ও বেশি। সব ধরনের শোষণ বিদ্যমান। তবে, নৈশ কাজ বন্ধ।

রয়্যাল্ কমিশন্ অন লেবার এর প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার দু-টি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যথা – ১৯৩৩ সালে চিলড্রেন অ্যাক্ট এবং ১৯৩৮ সালে এমপ্লয়মেন্ট অব্ চিলড্রেন অ্যাক্ট। দু-টি আইনই শিশুদের স্বাস্থ্যহানিকর শিল্প কর্মে নিয়োগ, তাদের কাজের সময় এবং মজুরী সংক্রান্ত। কিন্তু এই আইনগুলি বাস্তবে

সঠিকভাবে রূপায়িত হয় নি। আর একটি আইন – চাইল্ড্ লেবার অ্যাক্ট ও ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয়েছে। এই আইন অনুসারে ঝুঁকি সম্পন্ন কাজে যেমন – গৃহকর্ম, ধারা, হোটেল, রেস্তঁরা, চা দোকান, লজে কাজ নিষিদ্ধ। নিয়োগকারীদের ২০,০০০ টাকা জরিমানা বা এক বছরের জেল কিংবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

মহিলা শ্রমিকরাও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কম মজুরী পায়। যদিও ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরী আইনে সমান মজুরীর কথা বলা হয়েছে। সাধারণত পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার থাকে না। পাট, তুলো, চাল শিল্পে এই সুবিধা হয় আদৌ নেই অথবা অপ্রতুল। মহিলাদের ভূগর্ভে কাজ করা নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা ১৯৪৩ সালে তুলে নেওয়া হলেও ১৯৮৬ সালে আবার চালু হয়। নিয়োগকারীরা মাতৃত্বজনিত সুযোগ সুবিধা দিলেও শিশু যত্নের পরিষেবা নেই বললে হয়।

মহিলা শ্রমিকদের মর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে। আরও দেখা গেছে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগকারী, সহকর্মী, তদারককারী ও অন্যরা মহিলাকর্মীদের অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের বাড়ির কাজ করতে হয় বলে তারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না। মহিলা শ্রমিকরা অধিকাংশ নিরক্ষর এবং নিজে থেকেই কাজ শিখেছে।

পরিশেষে বলা যায় মহিলারা কৃষি ও শিল্প কর্মে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা উপযুক্ত কাজের পরিবেশ পায়। এবং একই কাজের জন্য পুরুষদের সমান পারিশ্রমিক দিতে হবে।

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রমিক সমস্যা এবং সমাজ কল্যাণ – আর. সি. সাক্সেনা

২। ইন্ডিয়ান সোস্যাল প্রোবলেমস্ – জি.আর.মদন

৩। লেবার প্রোবলেমস্ এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার – এস.আর.সাক্সেনা

৪। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ ইন ইন্ডিয়া – অপর্ণা রাজ

৫। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্য – পি. এল. মল্লিক

৭.১১ অনুশীলনী

১। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নীতি ও কাজকর্ম বিশ্লেষণ করুন।

২। শিল্পবিরোধের মূল কারণগুলি আলোচনা করুন।

৩। শিল্পবিরোধ অবসানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়াস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। শ্রম কল্যাণ কী? এর বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

৫। মাতৃত্বকালীন সহায়তা বলতে কী বোঝেন? এর মাধমে কি শর্তে কী কী সুযোগ দেওয়া হয়?

৬। ভারতীয় শিল্প শ্রমিকদের কর্মস্থলের পরিবেশ আলোচনা করুন।

৭। শিশু শ্রমিক বলিতে কী বোঝেন? এর কারণ কী? শিশু শ্রমিকদের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

একক ঃ ৮ কাউন্সেলিং পরিষেবা – গুরুত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল

গঠন

৮.১ ভূমিকা

৮.২ ধারণা

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর শ্রেণি বিভাগ

৮.৪ নীতি

৮.৫ কাউন্সেলিং-এর বিষয়

৮.৬ পদ্ধতি

৮.৭ কৌশল

৮.৮ উপসংহার

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১০ অনুশীলনী

৮.১ ভূমিকা

কাউন্সেলিং কথাটি বর্তমানে সারা বিশ্বে বহুল প্রচলিত। শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা কাউন্সেলিং বিষয়টিকে আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করেন। ভারতে পেশাগত পরিষেবা হিসাবে কাউন্সেলিং অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয়। (হাল-আমলে শুরু হয়েছে)। বিগত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে কাউন্সেলিং খুবই জনপ্রিয় পেশায় পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে কাউন্সেলিং খুবই বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে। বর্তমানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সার্বিকভাবে সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং শত শত বে-সরকারি সংস্থা এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের সংস্থা দিনের পর দিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, ব্যক্তিগত স্তরে – অসহায় ব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিকভাবে সাহায্য করার পদ্ধতি।

৮.২ ধারণা

যেহেতু, ভারতে কাউন্সেলিং পরিষেবা বহুল প্রচলিত নয়, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আমাদের ভুল ধারণা নতুবা অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। অনেক সময় আমরা মনে করি উপদেশ দেওয়াই কাউন্সেলিং। এই ভুল ধারণার প্রেক্ষাপটে বলা যায় উপদেশ কিংবা প্রশ্নোত্তর কিন্তু কাউন্সেলিং নয়।

বিজ্ঞানী পার্জ্ এর মতে কাউন্সেলিং হল কাউন্সেলি (পরামর্শগ্রহণকারী) এবং কাউন্সেলর (পরামর্শপ্রদানকারী) যিনি সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের পদ্ধতি। স্মিথ্ এর মতে কাউন্সেলিং হল – এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাউন্সেলর কাউন্সেলিকে তার পছন্দ, পরিকল্পনা বা খাপখাইয়ে নেওয়া ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। প্যাটারসনের মতে বিশেষজ্ঞ এবং এক বা একাধিক ক্লাইয়েনট্ এর পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পদ্ধতি যেখানে বিশেষজ্ঞ ক্লাইয়েনটের মানসিক অবস্থার উন্নতির জন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক গঠন জ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। ওয়েব্ স্টার অভিধানে বলা হয়েছে কাউন্সেলিং হল পরামর্শপ্রদান, মতামত বিনিময় এবং একত্রে বিবেচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণেমর পদ্ধতি। রোচারের মতে এটি হচ্ছে ব্যক্তিকে সাহায্য করা যেখানে সে নিজের সম্বন্ধে এবং তার পরিবেশে সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে সে সম্বন্ধে জানবে। এই পদ্ধতি আরো তাকে ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় বসতে এবং ভবিষ্যতে কেমন ব্যবহার হবে সে সম্বন্ধীয় কিছু লক্ষ্য এবং নৈতিকমান স্থির করতে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে বলা যায় কাউন্সেলিং হচ্ছে একটি পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুতপক্ষে, কাউন্সেলিং – একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিচার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক যাতে সে ভবিষ্যতে ঐরূপ সম্ভাব্য ঘটনার মোকাবিলা করতে পারে। এটা কোন সাহায্যের পরিষেবা নয়, বরং সহায়তাকল্পে পরিচালিত। কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশের জন্য সহায়তা করার পূর্বে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে। যদিও গাইডেন্স, সাইকোথেরাপী এবং কাউন্সেলিং সমার্থক শব্দ এবং তিনটি ধারণারই ভিত্তি – একটি সহায়তা প্রদানকারী সম্পর্ক যাতে ব্যক্তি নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবু এই তিনটি ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। কাউন্সেলিং হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা করা হয়। গাইডেন্স্ এর মাধ্যমে, ব্যক্তি যাতে নিজেকে বুঝতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। এবং সাইকোথেরাপী এক ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা যা মানসিক রোগে ভুগছে এমন ব্যক্তির জন্য। গাইড্, কাউন্সেলর এবং সাইকোথেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করার জন্য প্রায় একই ধরনের জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন। আবার প্রত্যেকের কিছু পৃথক পৃথক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার।

কাউন্সেলিং এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে খাপখাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া। এবং মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে নিজেকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যাতে চরম দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সক্ষম করা। সুতরাং, মানসিক প্রতিবন্ধী ও ভারসাম্যহীন এবং হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্য কাউন্সেলিং প্রয়োজন। আবার সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম, আত্মবিশ্বাসহীন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি এমন মানুষের জন্যেও কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্ব

চিরাচরিতভাবে সমাজে এটা দেখা গেছে যে কিছু মানুষ সমস্যার সৃষ্টি করছে আবার কিছু মানুষ তা সমাধান করছে। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সেলিং পরিষেবার গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে। বর্তমান সমাজে যা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানের সমাজের বুনন অতীতের মতো এত গভীর নয় যেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব সুন্দর ছিল এবং সমস্যার সমাধানে একে অপরকে সাহায্য করত। এখন হাজার হাজার মানুষ একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। এমনকি প্রত্যন্ত এলাকাতেও এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে অন্তর্নিহিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে একটি ভাসাভাসা সম্পর্ক বজায় রাখা। এমনকি পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও ঐ ধরনের সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সমাজ ক্রমশ জটিল হচ্ছে এবং ব্যক্তি মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করছে। এই কারণে আচরণগত সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামো মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই, পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামো মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য কাউন্সেলিং এর মতো বিশেষ পরিষেবা প্রয়োজন হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা, অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, ধর্মীয় আনুগত্যহীনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতি আমাদের জীবন ও জীবিকায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কাউন্সেলিং-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং এরূপ কিছু বিষয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে খুবই প্রভাবিত করছে। মানুষ নিজে থেকে কিছু কিছু সমস্যা সমাধান করতে কিংবা সমস্যার গভীরতা কমিয়ে আনতে সক্ষম। অনেক সময় পরিবারের সদস্য-সদস্যা, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধান ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য শহর এবং গ্রাম উভয় ক্ষেত্রে মানুষ কাউন্সেলিং এর মতো পেশাগত পরিষেবার গুরুত্ব অনুভব করছে।

অতীতে, সমাজ অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল ছিল এবং মানুষের চাহিদা কম বা সীমায়িত ছিল। যার ফলে সমস্যাও কম ছিল। আর বর্তমানে, জীবন জটিলতায় ভরপুর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষা ও সুকুমার প্রবৃত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি কাউসেলিং এর মতো বিশেষ, পেশাগত পরিষেবা আবশ্যিক করে তুলছে। যে সকল ব্যক্তি দৈনন্দিন কাজকর্মে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারছে না তাদের জন্য এই কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রয়োজন।

মানুষকে সারা জীবনে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারা মানসিক চাপ এবং ঝুঁকি এগিয়ে যেতে পারে না। আবার স্বেচ্ছায় উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। বরং নানা কারণে এই পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ব্যক্তি নিজে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এরূপ পরিস্থিতিকে ব্যক্তিগত-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা হিসাবে দেখা হয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সক্ষম করার জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবার দরকার।

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর শ্রেণি বিভাগ

কাউন্সেলিং দু-ধরনের হতে পারে (১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং (২) গোষ্ঠীভিত্তিক।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং ইন্টারভিউ (প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে। ইন্টারভিউ আবার নানা ধরনের হতে পারে যেমন ঃ ইনট্রোডাক্টরী ইন্টারভিউ, ফ্যাক্ট্ ফাইন্ডিং ইন্টারভিউ, ইনফরমেটিভ্ ইন্টারভিউ এবং থেরাপিউটিক্ ইন্টারভিউ।

ইনোডাক্টরী ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হয় যাতে পরবর্তী ধাপগুলি সহজে অনুসরণ করা যায়। প্রথমে কাউন্সেলর নিজের পরিচয়, ইন্টারভিউ এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে ধারণা দেন।

ফ্যাক্ট্ ফাইন্ডিং ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রতি কাউন্সেলির আচরণ কেমন যা লিখিত আকারে প্রকাশ পায় নি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ কাউন্সেলি ও অপরের সঙ্গে সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানে ব্যবহার করা হয়।

ইনফরমেটিভ্ ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ইন্টারভিউই (ক্লাইয়েনট্) এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়। থেরাপিউটিক্ ইন্টারভিউ থেরাপিউটিক্ উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ক্লাইয়েনট্ তার সমস্যা, স্বপ্ন, উচ্চাশা ইত্যাদি কাউন্সেলরের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পায়। তার অতীত – বর্তমান, আশা-আশঙ্কা ইত্যাদিও আলোচনা করতে পারে।

অন্যদিকে গ্রুপ কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে কাউন্সেলি সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কাউন্সেলি তার সহপাঠী বা সহকর্মীদের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা শুনবার সুযোগ পায়। এরূপ আলোচনা তাকে তার নিজস্ব সমস্যা অনুধাবন করতে বা বুঝতে সাহায্য করে। সীম্যানের মতে গ্রুপ কাউন্সেলিং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী।

৮.৪ নীতি

কাউন্সেলিং কয়েকটি নীতি দ্বারা পরিচালিত যেমন–

(ক) প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র

এটা স্বাভাবিক যে প্রতিটি মানুষ অন্যদের তুলনায় নানা দিক থেকেই আলাদা। সুতরাং, কাউন্সেলর যদি সবার সমস্যার কারণ এবং সমস্যা সমাধানের ধাপ একই রকম মনে করে কাউন্সেলিং করতে যায় তাহলে ভুল হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে একের সমস্যা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং আলাদাভাবে তা সমাধান করতে হবে।

(খ) সিদ্ধান্ত এবং অনুভূতি যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়

কাউন্সেলর কখনই নিজের অনুভূতি কাউন্সেলির উপর চাপিয়ে দেবে না কারণ তা পরিস্থিতির উন্নতিতে সাহায্য করে না। বস্তুতপক্ষে চাপিয়ে দেওয়া হলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে তাই তা বর্জনীয়। যেহেতু

চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা তাই কাউন্সেলরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

(গ) ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। সুতরাং কাউন্সেলর কখনই যেন মনে না করে যে এদের দ্বারা কিছু হবে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ভরসা রেখে কাউন্সেলরকে কাউন্সেলিং শুরু করতে হবে। এখানে তার ভূমিকা হবে – কাউন্সেলি যাতে তার স্বভাব-প্রকৃতি, ক্ষমতা ও সৃজনশীল শক্তি অনুধাবন করে নিজেরে মানসিক সমস্যার সমাধান করতে পারে – সে ব্যাপারে সাহায্য করা। কাউন্সেলর সফল হওয়ার প্যাপারে সবসময় আশাবাদী থাকবে। তার কাজ হবে ক্লাইয়েনট্ কে বিশ্বাস করানো যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা তার রয়েছে।

(ঘ) সঠিকভাবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ

কাউন্সেলিং এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাউন্সেলিং সমস্যা সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং বিশ্লেষণ ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে শোনা। এটি সমস্যার উৎস অনুধাবন করতে এবং কাউন্সেলির বিষয়টি যে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে সেই ধারণা সৃষ্টির জন্য আবশ্যিক। সঠিকভাবে মনোযোগ সহকারে না শুনলে কাউন্সেলির মনস্তাত্ত্বিক জগতে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মনোযোগ সহকারে শোনা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। কাউন্সেলি কি বলছে এবং ঠিক কি ঘটেছে তা বুঝবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হল এই পদ্ধতি। মনোযোগ সহকারে শোনবার সাথে সাথে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে।

(ঙ) গোপনীয়তা বজায় রাখা

কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং আস্থা অর্জন করা খুবই জরুরি। কাউন্সিলরের উচিত কাউন্সিলির কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য গোপন রাখা। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কারো কাছেই ঐ সব তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয় না। যেহেতু কাউন্সেলিং একটি পেশায় পরিণত হয়েছে তাই কিছু পেশাগত নৈতিকতা মেনে চলা উচিত। গোপনীয়তা বজায় রাখা এই ধরনের একটি ব্যাপার যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(চ) কাউন্সেলিং এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন

যেহেতু কাউন্সেলিং একটি পেশাগত পরিষেবা তাই উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই কাজে নিযুক্ত হওয়া দরকার। অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হাতুড়ে চিকিৎসকের মতো। তাদের প্রদেয় পরিষেবা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে না বরং পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। সুতরাং কেবল উপযুক্তভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই কাজে যুক্ত থাকবে।

(ছ) কাউন্সেলিং-এর অর্থ উপদেশ দেওয়া নয়

কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সহায়তা করা হয় উপদেশ দেওয়া হয় না। কাউন্সিলরের কাজ হচ্ছে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে কাউন্সেলি তার সমস্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতি

স্বভাবতই ক্লায়েনটকে তার সমস্যা লাঘবের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সরাসরি সমস্যার সমাধান নয়, কাউন্সেলরের প্রবণতা হওয়া উচিত ক্লায়েনট্ যেন তার সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

(জ) গ্রহণ করার রীতি

কাউন্সেলিং পরিষেবার অপরিহার্য উপাদান হল গ্রহণ করা। কাউন্সেলি যেমনই হোক না কেন কাউন্সেলর তাকে সহজভাবে গ্রহণ করবে। এরূপ আচরণ না করলে ক্লায়েনটের আস্থা অর্জন করা খুবই কঠিন। এবং ক্লায়েনটের সঙ্গে অর্থবহভাবে আস্থা অর্জন করতে না পারলে প্রচেষ্টা সফল হবে এমন আশা কাউন্সেলর করতে পারে না। রোজার এই বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রহণ করার ব্যাপারটি শর্তবিহীন হবে। শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করার ব্যাপারটি কাম্য নয়।

(ঝ) আচরণে নমনীয়তা

ক্লায়েনটের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাউন্সেলর প্রয়োজন অনুসারে নমনীয় হবে। অনমনীয় মনোভাব কাউন্সেলিং পদ্ধতির সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করে। যেহেতু কাউন্সেলিং চিরকালের শিক্ষার বিষয় তাই কাউন্সেলর বিভিন্ন মতামত, ধারণা ও পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব দেখাবে। বস্তুতপক্ষে, একজন সফল কাউন্সেলর হতে হলে যুক্তিযুক্তভাবে নমনীয় থাকতে হবে।

উপরোল্লিখিত মৌলিক নীতিগুলি ছাড়াও বেশ কিছু বিষয় যেমন পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া, সম-অনুভূতি ও সমবেদনা, সামঞ্জস্য, অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৫ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র

আর্থ-সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহবধূ, চাকুরিজীবী, সামরিক কর্মী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, বেকার যুবক, বয়স্ক ব্যক্তি, একাকীত্বের শিকার এমন মানুষের কোন না কোন সময়ে কাউন্সেলিং পরিষেবার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও কাউন্সেলিং এর মূল ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ–

(ক) ফ্যামিলি কাউন্সেলিং

পরিবারের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব, ঝগড়াঝাটি, শারীরিক ও মানসিক পীড়ন – অত্যাচার, অবহেলা এবং সংশ্লিষ্ট মানসিক চাপ দেখা যায়, যা সুস্থ পারিবারিক জীবনের অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং দক্ষতা ছাড়াও কাউন্সেলরকে পরিবারের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়।

(খ) ম্যারিট্যাল্ কাউন্সেলিং

বিভিন্ন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পণ প্রথা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, জীবনধারা, বদ অভ্যাস, যৌন অতৃপ্তি, অর্থাভাব, কন্যাসন্তানের জন্ম, স্ত্রীর পিত্রালয়ের অত্যধিক নাক গলানো ইত্যাদি নানা কারণে সচরাচর স্বামী-স্ত্রী বিবাদ হয়ে থাকে। ম্যারিট্যাল্ কাউন্সেলিং বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরে হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গ্রুপ কাউন্সেলিং উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(গ) ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং

জীবিকানির্বাহের উপায় এবং জীবনের উন্নতির জন্য বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা, স্বাভাবিক ক্ষমতা, সমন্বয়, শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। আচরণের দিকটিও জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারভিউর সম্মুখীন হওয়ার জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উপরোল্লিখিত তিনটি ছাড়াও ভোকেশনাল কাউন্সেলিং, হেলথ্ কাউন্সেলিং, এডুকেশন্যাল, কাউন্সেলিং, মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সেলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

৮.৬ পদ্ধতি

কাউন্সেলিং এর জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে

(ক) ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতি বা রীতি কাউন্সেলর কেন্দ্রিক। এটি অথরিটেরিয়্যান্ এপ্রোচ নামেও পরিচিত। এখানে কাউন্সেলর মনে করে যে ক্লায়েনটের সমস্যা যে তার জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সমাধান করবে। অর্থাৎ, ক্লায়েনট অসহায় এবং কেবলমাত্র কাউন্সেলরই তার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি ইনটিলেকটিউয়্যাল্ প্রোসেস্ বলে ধরা যেতে পারে।

ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্ এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কাউন্সেলরের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানসূত্র অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নাও হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, প্রতিটি ক্লায়েনটের পটভূমি এবং সমস্যা ভিন্ন। সুতরাং কাউন্সেলর যদি কেবলমাত্র এই পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সমস্যা বাড়তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কাউন্সেলর একজন মানুষ মাত্র। সে কখনই দাবি করতে পারে না যে ক্লায়েনটের সব সমস্যা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছে। এবং তা হয়ে থাকলে কাউন্সেলিং প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাউন্সেলি খুব বেশি উপকৃত হবে না। তৃতীয়তঃ এই ডিরেকটিভ্ কাউন্সেলিং কাউন্সেলরের কাছে অনেক সময় বোঝা স্বরূপ। একদিকে কাউন্সেলিং এর জন্য তাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় অন্যদিকে যদি সমস্যা না কমে তবে সম্পূর্ণ দোষ, দায়িত্ব কাউন্সেলরকে নিতে হয়।

(খ) নন-ডিরেকটিভ্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতিতে কাউন্সেলর কাউন্সেলিকে সাহায্য করে যাতে সে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এবং তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে। এখানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেখানে নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কাউন্সেলি সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। দক্ষ পরিষেবার দ্বারা কাউন্সেলর কাউন্সেলির আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যা সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক শর্ত।

এই পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, একজন হতাশাগ্রস্ত, দিশেহারা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলি সমসময় আশা করে যে কাউন্সেলর তার জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। কিন্তু এখানে কাউন্সেলর নিজে সমাধান না করে বিষয়টি কাউন্সেলির দিকে ঠেলে দেয় যা কাউন্সেলির মনে আবার হতাশা সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) ইলেকটিক্ এপ্রোচ্

এই পদ্ধতি খুবই নমনীয়। এখানে ক্লায়েনটের জন্য প্রযোজ্য যেকোন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। বিশেষ কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী নেই। কাউন্সেলর প্রয়োজন মতো ডিরেকটিভ্ বা নন-ডিরেকটিভ্ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাউন্সেলর যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পারে তবে তা খুব বেশি কার্যকরী হবে না। তবে বলা যায়, ইলেকটিক্ এপ্রোচ কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বাস্তবোচিত এবং উপযুক্ত পদ্ধতি।

৮.৭ কৌশল

কাউন্সেলিং পরিষেবা মূলত এক এক জনকে স্বতন্ত্র্যভাবে দেওয়া হয়। এটি কাউন্সেলর ও কাউন্সেলির ব্যাপার। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রুপ কাউন্সেলিং করা হয়। যেহেতু গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করা তুলনামূলকভাবে কঠিন তাই কেবল দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের গ্রুপ কাউন্সেলিং করা উচিত। কাউন্সেলিং যা একটি পেশায় পরিণত হয়েছে তা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে–

(ক) কাউন্সেলর ও কাউন্সেলির মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে আলোচনা।

(খ) কাউন্সেলরের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দরকার যাতে সে সমস্যার উৎস অনুসন্ধান করতে পারে, গভীরতা অনুভব করতে পারে এবং উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কাউন্সেলিকে তার সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে।

(গ) কাউন্সেলিকে সক্ষম করা যাতে সে উপযুক্তভাবে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। যেহেতু, ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথ হল কাউন্সেলিং তাই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল অবলম্বন করা হয়–

(১) রিলেশান টেকনিক্

কাউন্সেলিং এমন একটি পরিষেবা যা ক্লাইয়েনটের আস্থা অর্জন ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না। এই সম্পর্ক ভাসাভাসা নয় এটি হার্দিক, সমবেদনাপূর্ণ এবং বোঝাপড়া সম্পন্ন হবে। হার্দিক সম্পর্ক নানাভাবে কাজে লাগে। প্রথমত কাউন্সেলি তার অনুভূতি, মতামত এবং আচরণে ইতস্তত বোধ করে না। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলর সমস্যার গভীরতা এবং তার কারণ অনুধাবন করতে পারে। যেহেতু, কাউন্সেলিং পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কাউন্সেলর এবং কাউন্সেলির সম্পর্ক তাই সম্পর্ক তৈরির জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। অন্যথায়, অনুভূতির বহির্প্রকাশ এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় যা কাউন্সেলিং এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা সম্ভবপর নয়। ফলে কাউন্সেলিং পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(২) ইন্টারভিউ টেকনিক্

কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাউন্সেলরকে ইন্টারভিউ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ক্লায়েনটের মন বুঝতে হলে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভালো কৌশল নেই। ডিরেকটিভ, নন-ডিরেকটিভ্

বা ইলেকটিক্ পদ্ধতি যাই অনুসরণ করা হোক না কেন, ইন্টারভিউ আবশ্যিক। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে সমস্যার কারণ সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়।

(৩) নন-টেস্ট্ ক্লায়েনট্ এপ্রাইজাল টেকনিক্

এখানে দিনপঞ্জী, জীবনপঞ্জী, রেটিং স্কেল, কোন বিশেষ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য সঞ্চিত তথ্য ব্যবহার করা হয়। দিনপঞ্জী এবং জীবনপঞ্জী হল অর্ন্তদর্শন সংক্রান্ত তথ্য। কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের প্রয়োজন কারণ এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পরিমাপ করার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য সঞ্চিত তথ্য ক্লায়েনটকে সুসংহতভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

(৪) সাইকোডায়্যাগ্নোসিস্

কাউন্সেলিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল সাইকোডায়্যাগ্নোসিস্। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউন্সেলিকে এবং তার সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে বোঝা। এই কথাটির অর্থ হল কাউন্সেলির প্রকাশিত লক্ষণ, উপসর্গ এবং বৈশিষ্ট্য শ্রেণিবিভাগ করে তার অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা। উইলিয়মসন্ যিনি বলেছিলেন উপসর্গ দেখে নির্ণয় হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সারমর্ম, তিনি রোগ নির্ণয়কে (ডায়্যাগনৌসিস) তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন। তা হল – ব্যক্তির ডায়্যাগনোসিস্ এবং কাউন্সেলির আরোগ্যলাভের আশা সংক্রান্ত ডায়্যাগনোসিস্।

ইগান্ কাউন্সেলিং শুরুর পাঁচটি প্রণালীর কথা বলেন। তাঁর প্রণালী এস.ও.এল.ই.আর. নামে পরিচিত। যা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে–

(S) এস. – স্কোয়্যারলি (Squarely) - ক্লায়েনটের ঠিক সামনাসামনি বসা এর অর্থ হল আমি তোমার জন্য প্রস্তুত।

(O) ও. - ওপেন পশ্চার (Open posture) - যার অর্থ কাউন্সেলিকে ইঙ্গিত দেওয়া যে কাউন্সেলর তার কথা খোলা মনে শুনবার জন্য আগ্রহী।

(L) এল. - লীন (Lean toward the client) - কাউন্সেলর কাউন্সেলির দিকে অল্প ঝুঁকে থাকবে অর্থাৎ সে ক্লায়েনটের সঙ্গে আছে এবং সে যা বলছে তা আগ্রহ সহকারে শুনছে।

(E) ই. - আই কন্ট্যাক্ট (Eye contact) - চোখে চোখ রাখা অর্থাৎ বোঝানো যে মনোযোগ ও আগ্রহ রয়েছে এবং ক্লায়েনট যেন অনুভব করে যে তাকে বুঝবার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(R) আর. - রিল্যাক্সড্ (Relaxed) - অপেক্ষাকৃত সহজ থাকা - এর ফলে কাউন্সেলর এবং কাউন্সেলি উভয়ে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, যদিও কাউন্সেলিং এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করা দরকার, তবু কাউন্সেলর যেন বেশি মাত্রায় কৌশল সম্বন্ধে সচেতন না হয়। দ্বিতীয়ত, কৌশলগুলি অন্ধের মতো যেন ব্যবহার না করা হয়। সেক্ষেত্রে কাউন্সেলরের ভূমিকা উপহাসযোগ্য হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট নীতি ও তত্ত্ব চাড়া কৌশল অর্থহীন। সুতরাং, কাউন্সেলর কৌশলকে যেন তার তত্ত্ব থেকে পৃথক না করে।

৮.৮ উপসংহার

এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষে কাউন্সেলিং পরিষেবা ব্যাপকভাবে শুরু হয় নি। বিষয়টি মূলত শহর কেন্দ্রিক আছে। সাধারণ মানুষেরা সচেতন নয় আবার সামাজিক সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে সক্রিয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবক, পিতামাতা, প্রশাসক ও শিক্ষক কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না এবং এই পরিষেবার জন্য সময় দেন না, চেষ্টাও করেন না। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকলের এই পরিষেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে যত্নবান হয় তবে নেশা, মাদকাশক্তি, নারী নির্যাতন, স্কুল-ছুট, অশিক্ষা, অনৈতিক ব্যবসা এবং আত্মহত্যার মতো সমস্যা অনেকটাই কমবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে

(ক) কাউন্সেলিং একটি স্বতন্ত্র্য পরিষেবা।

(খ) উপযুক্তভাবে বৃহত্তর এলাকায় এই পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(গ) বিদ্যালয়, কার্যালয় এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে এই পরিষেবা আবশ্যিক করা প্রয়োজন।

(ঘ) কাউন্সেলিং এর অনুকূলে কিছু পরিষেবা ও কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

(১) কাউন্সেলিং স্যুপারভিসন্ - এম. ক্যারোল্

(২) ডিভেল্যাপমেন্ট কাউন্সেলিং - ব্লোচার

(৩) ইনট্রোডাকশন্ টু কাউন্সেলিং - ই. এল. টুলবার্ট

(৪) টুওয়ার্ডস্ ইফেক্টিভ্ কাউন্সেলিং এন্ড্ সাইকোথেরাপী - ট্রুএক্স সিবি এবং কারখাফ

(৫) দ্য বেসিক্ ইসেনশিয়্যালস্ অব্ কাউন্সেলিং - আই. দেব

৮.১০ অনুশীলনী

(১) কাউন্সেলিং কী এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(২) কাউন্সেলিং এর মৌলিক নীতিগুলি আলোচনা করুন।

(৩) কাউন্সেলিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি (এপ্রোচ্) আলোচনা করুন।

(৪) কাউন্সেলিং পরিষেবার বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।